## ৪ শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০)

**জীবনী :** অরবিন্দ ঘোষের জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট, ভোর ৪-৩০ মিনিটে তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীমনোমোহন ঘোষ এর বাড়িতে। বর্তমানে এটি সেকস্‌পিয়ার সরণী নামে চিহ্নিত। অরবিন্দের পিতার নাম - ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতার নাম স্বর্ণলতা দেবী। ডাঃ কে.ডি.ঘোষ উগ্র সাহেবী মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং অরবিন্দের পাঁচ বছর বয়সের সময়েই তার অন্য দুই পুত্র সহ দার্জিলিং -এর লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়তে পাঠান বিলিতি আদব-কায়দা শেখানোর জন্য।

১৮৭৯ সালে অর্থাৎ শিশু অরবিন্দ দুই বৎসর দার্জিলিং-এ থাকার পরই ডাঃ ঘোষ সপরিবারে ইংলণ্ডে যায় ও তার তিন ছেলে - বিনয়, মনোমোহন ও অরবিন্দকে পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে রেখে আসেন। ইংল্যাণ্ডে অরবিন্দ ২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকেন। ঐ সময়ে পিতার নির্দেশে তিন ভাই এরই ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করা বারণ ছিল।

প্রথমে অরবিন্দ ও তার অপর দুই ভাই ম্যানচেষ্টারে পাদরী ড্রুয়েট ও তার স্ত্রী মিসেস ড্রুয়েটের অভিভাবকত্বে তাঁদের পরিবারে থাকেন। বড় দুই ভাই সেখানকার গামার স্কুলে ভর্তি হলেও অরবিন্দের বয়স মাত্র ৭ বলে তাকে বাড়িতেই ড্রুয়েট পরিবার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের সেন্টপলস্ স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি ক্ল্যাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ বিশেষ করে গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এমনকি ঐসব ভাষায় কবিতা রচনাও করেন।

১৮৯০ থেকে ১৮৯২ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি কেমব্রিজে অধ্যয়ন করেন। এখানে ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপোস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। কেমব্রিজে ভারতীয় মজলিসের সম্পাদক থাকাকালে তিনি বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি লণ্ডনে ভারতের স্বাধীনতাকামী চরমপন্থী দল 'লোটাস ও ড্যাগারের' সঙ্গে যুক্ত হন। এ সময়ই তিনি আই.সি.এস এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। এরপর কয়েকবার তাকে ঐ পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন।

১৮৯৩ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং বরোদা রাজ্যের কাজে যোগ দেন। বরোদা রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে কিছু কিছু কাজ করার পর তাকে স্থায়ীভাবে বরোদা রাজ কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় তিনি নিজেকে কঠিন জ্ঞান তপস্যায় নিযুক্ত করেন। এই সময়ই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের, বিশেষ করে সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।



১৯০১ সালের ১৭ই এপ্রিল তার বিয়ে হল মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে যতীন (পরবর্তীকালে নিরালম্ব স্বামী) ও ভাই বারীন ঘোষকে নিয়ে কলকাতায় একাধিকবার তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবী সমিতি গড়ার জন্য। এই সময় কলকাতায় ব্যারিষ্টার পি.মিত্রের সঙ্গে বিপ্লবী সংগঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজপুত যুবরাজ ঠাকুর রাম সিং এর নেতৃত্বে গঠিত মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী দলের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। এই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীন দলের সর্বোচ্চ কাউন্সিলের পাঁচ সদস্যের একজন সদস্যা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এ সময় মাধব রাও নামে এক যুবককে সামরিক শিক্ষা নেওয়া ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের জন্য টাকা দিয়ে ইউরোপ পাঠিয়েছিলেন অরবিন্দ- এমন তথ্যও পাওয়া যায় স্ত্রীকে লেখা চিঠি থেকে।

১৯০৫ সালের ৩০ শে আগষ্ট স্ত্রী মৃণালিনীদেবীকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন : আমার তিনটে পাগলামী আছে।

এক:—ভগবানের দান ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া। দেশের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জন্য সময়, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে নিজে অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করা।

দুই :— কোনমতে ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া।

তিন:— আমি স্বদেশকে মা বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসে যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে বসে? স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করতে বসে? না মাকে উদ্ধার করতে দৌড়ে যায়?

১৯০৬ সালে যুগান্তরে তিনি প্রবন্ধ লেখেন এবং বন্দেমাতরম নামে ইংরেজী পত্রিকার সহ-সম্পাদক হলেন। এ সময়ই বরোদার কলেজের ৬৫০ টাকার অধ্যক্ষের স্থায়ী পদের চাকুরী ছেড়ে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে মাত্র ১৫০ টাকার চাকরী নিলেন। কিন্তু সেখানেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা হল না।

১৯০৭ সালে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিলেন বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। ইংরেজের অধীনে হোমরুল নয় পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করলেন। সুরাট থেকে ফেরার পথে যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছে বরোদায় যোগের দীক্ষা-গ্রহণ করেন।

১৯০৮ সালের ৩রা মে আলিপুর বোমা মামলায় ভাই-বারীনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। জেলখানার মধ্যেই যোগ দর্শনের মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটল। ১৯০৯ সালের ৬ই মে জজ বীচ ক্রাফট রায় দিলেন শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ। ১৯১০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী গোপনে নৌকায় তিনি চন্দননগরে এলেন। তারপর ৪ঠা এপ্রিল আবার গোপনে নৌকায় কলকাতায় এসে ডুপ্লে জাহাজে ফরাসী অধ্যুষিত পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তার জীবন অতিবাহিত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তাঁর ভাবশিষ্যা মিরা রিচার্ড পরবর্তীকালে 'মাদার' আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন শ্রীঅরবিন্দ নিজের যোগসাধনাতেই মগ্ন থাকতেন। আজ পণ্ডিচেরী আশ্রম ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে এক উজ্জ্বল গ্রহ বিশেষ!

**শ্রীঅরবিন্দ : দার্শনিক প্রেক্ষাপট (The Philosophical Background):**

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন যে সব প্রভাব বহন করছে তাঁর পূর্বসূরীদের তত্ত্ব মধ্যে প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের গ্রীক দর্শনের স্থান যেমন আছে, তেমনি পাশ্চাত্যের পরবর্তীকালের দার্শনিক হেগেল,

হোয়াইটহেড এবং প্রাণবাদী দার্শনিক বার্গশ এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর দর্শনে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্ত এবং যোগ দর্শনের। তবে এই সমস্ত দর্শনের সমস্ত ভাবনাকেই তিনি পুনঃসংগঠিত করেছেন। পুনঃবিশ্লেষণ করে এক অভিনব সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন নিজের দর্শনে।

সামগ্রিক অর্থে, শ্রী অরবিন্দের দর্শনকে ভাববাদী দর্শন বলা যায়। এই দর্শনকে ভাববাদী বলার প্রথম কারণ, এই দর্শনের সত্যতা—আধ্যাত্মিক সত্যতা, আর দ্বিতীয় কারণ এই দর্শনে মানব প্রজন্মের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হিসাবে এক আদর্শ 'দিব্য জীবন'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাঁর 'ভাববাদ'কে 'অদ্বৈতবাদ' বলা যাবে না অথবা 'ঈশ্বরবাদ' এর একটি ব্যক্তিগত রূপও বলা যাবে না। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনকে যথাযথ নামে চিহ্নিত করেছেন হরিদাস চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে, 'পূর্ণ-অদ্বৈত' অথবা 'পূর্ণ-বিজ্ঞান' অথবা 'পূর্ণবাদ' বলে। তবে তার এই পূর্ণ-অদ্বৈতবাদ শঙ্করের অদ্বৈত মায়াবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

**দ্বিবিধ অস্বীকার (Two Negations):**

শ্রীঅরবিন্দের 'দর্শন'-এর সমগ্র কাঠামোটি যে মূল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাহল 'আত্মা' এবং 'জড়' উভয়ই সত্য— এদের প্রকৃত সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়েই যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ জানতেন 'জড়বাদ' এবং 'আধ্যাত্মবাদ', দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব এই জগতকে নিজের নিজের মতো ব্যাখ্যা করেছে এতদিন। জড়বাদীরা যেমন 'আত্মা'কে মনের কল্পনা বলে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করেছে, তেমনি আধ্যাত্মবাদীরাও আবার এই জড়-জগৎকে মিথ্যাস্বপ্ন ও কল্পনামাত্র বলে অবজ্ঞা করে এসেছে। সেদিক থেকে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন হল এই দুই এর সমন্বয়। 'দিব্যজীবন' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন: পৃথিবীতে দিব্য জীবনের উপলব্ধি ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি যে দেহের প্রাসাদের মধ্যেই চিরন্তন আধ্যত্মশক্তির বাস। শ্রীঅরবিন্দের মতে, জড়বাদীদের কাজ সহজ। তারা আধ্যাত্মসত্তা অস্বীকার করে সহজেই ঘোষণা করে জড় এবং গতির অদ্বৈতবাদ, তবে এই জড়বাদী অদ্বৈতবাদ বেশি দিন কার্যকরী হয় না। কেননা জড়বাদীদের সমস্ত জ্ঞানের নির্ভরতা শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের উপর। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এলাকা এবং প্রয়োগ খুবই সীমিত। যেসব বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তাদের থেকে তুলনামূলকভাবে যে সব বস্তুকে জানা যায়, সেগুলি অর্থহীন। আধুনিক জড়বাদীরা দাবি করেন যে, তাদের তত্ত্বের পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন আছে। জড়বাদকে বলা হয় অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্পন্ন।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, বৈজ্ঞানিক সমর্থনও জড়বাদীদের আধ্যাত্মতত্ত্বের অস্বীকৃতিকে সমর্থন করে না। এমন কি আমাদের 'বুদ্ধি' যদিও জড়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য হয় না এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে পরিণামে কম-বেশি 'তাত্ত্বিক গঠন' এ আশ্রয় নেয়—যা প্রকৃতপক্ষে জানার যোগ্যই নয়। এমনকি 'বিজ্ঞান' এর ওপর জড়বাদী দিক থেকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আরো মৌলিক বিষয়, 'বৈজ্ঞানিক আত্মা'(The scientific Spirit)কে উপেক্ষা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন উঠতেপারে, 'বৈজ্ঞানিক আত্মা' কি? এটা শ্রীঅরবিন্দের মতে, এটা এমন এক আত্মা, যে জানে না কোথায় থেমে থাকার স্থান, যে সম্ভবতঃ অচেতন আছে বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এবং যে প্রত্যেক সমস্যার সমাধান খোঁজে কেবল আর এক সামনের পদক্ষেপে



- নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাই বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নির্দেশ করে তার পেছনের দিকে। বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। তাই অ-জড়কে জড়ের অস্বীকার, প্রকৃতপক্ষে আত্ম-বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধ্যাত্মিকতাবাদীদের জড়কে অস্বীকৃতিও সমভাবে একপেশে। প্রাসঙ্গিকভাবে 'দিব্যজীবন' গ্রন্থের (পৃ.১৬) তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : 'জড়বাদী যদি বলেন, জড়ই একমাত্র তত্ত্ব, প্রাতিভাসিক জগৎই একমাত্র বস্তু যার প্রামাণ্যকে মোটের উপর নিশ্চিত মনে করা চলে। এর পরেও যদি কিছু থাকে, সে আমাদের জানার বাইরে - সম্ভবতঃ তা অসৎ বা মনের বিকল্প অথবা বস্তু হতে অবচ্ছিন্নভাবের একটা খেয়াল শুধু। - তাহলে অধরার টানে বাউল সন্ন্যাসীও বলতে পারেন: শুদ্ধ চিৎ-ই একমাত্র তত্ত্ব - তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পরিণাম নাই। এই ব্যবহারিক জগৎ শুধু ইন্দ্রিয় ও মনের কল্পনা বা স্বপ্নবিলাস। শুদ্ধবিদ্যার শাশ্বতদীপ্তি হতে পরাঙ্মুখ অবিদ্যাচিত্তের এ একটা বিকল্প মাত্র। ... এমনি করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হতে দুজনেই ভাবতে পারেন, তাঁর মতই সত্য।'

আধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী দাবি করেন তাঁরা অতিন্দ্রিয় সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন, উচ্চ চেতনা কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হয় না কোন কিছুর দ্বারাই এবং তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের থেকে আরো সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে। শ্রী অরবিন্দ বলছেন, তাঁদের এই জ্ঞানই জড়জগতের সত্যতাকে অস্বীকার করতে প্রেরণা দেয়। আর এ জন্যই ভারতীয় যোগী এই 'জগৎ মিথ্যা' অথবা 'ব্রহ্মের মায়াবী রূপ' বলে মনে করেন।

কিন্তু এই যোগীদের দৃষ্টিতে একটি সহজ ঘটনা ধরা পড়েনি। যদি 'সত্য' আধ্যাত্মিক হয়, তবে জড়ের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে। তাই জড়কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও ভ্রমাত্মক। জড় এবং চিৎ- একই বিষয়ের দুটি দিক মাত্র। যদি জড় থেকে চিৎ এ উন্নীত হওয়া যায়, তবে অবশ্যই চিৎ থেকে জড়তে অবতরণ করা যায়। তাই জড়জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে বেদান্তে এই ভুল করা হয়েছে। বেদান্তে এই বোধ উপেক্ষিত হয়েছে যে, প্রত্যেক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে বিজড়িত বা সংকোচন। তাই শ্রীঅরবিন্দ চেষ্টা করেছেন, তাঁর দর্শনে চিৎ ও জড় শক্তির সমন্বয়ের কথা বলেছেন — চিৎ এবং জড়কে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়েই।

**সত্যতা — সচ্চিদানন্দ (Reality - Saccidananda):**

শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যার মূল চালিকা শক্তি হল চিৎশক্তি। সত্যতাকে তিনি চরম আধ্যাত্মিকতা রূপে দেখলেও তার মধ্যে জড়কেও স্থাপন করেছেন। তাই তিনি 'দিব্য জীবন' গ্রন্থের (পৃ.২৩) চতুর্থ অধ্যায়ে বলছেন : 'শুদ্ধচিৎ তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে। আবার বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই বিসৃষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না যখন, তখন সত্যের এমন একটা পরিপূর্ণ রূপ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁত সমন্বয়। যার মিলনমন্ত্রে মানুষের জীবনে পায় তারা স্বাধিকারের মর্যাদা এবং তার চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থক। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুণ্ণ হবে না, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের গৌরব কোথাও ম্লান হবেনা। স্বীকার করতে হবে, দুয়েরই মূলে আছে এক মর্ম সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা।'

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের বৈদান্তিক ধারণার এক অপেক্ষকৃত কম আলোচিত দিককে তুলে

ধরেছেন তাঁর দর্শনে। তিনি অনুভব করেছিলেন বিশ্বচেতনায় চিৎ ও জড়ের একটি মিলনস্থল আছে। 'এইখানে এসে চিৎ এর কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চিৎও হয় সত্য। কারণ বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অখণ্ড সত্তার অন্তরিক্ষলোক - পরাপর তত্ত্বের মাঝে তারা যেন সেতু।'

এই বিশ্বচেতনার প্রবণতা অতিন্দ্রিয় চেতনার দিকে ধাবিত যা অজ্ঞেয়ের চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এই অজ্ঞেয়'—যদিও জ্ঞানের অতীত, তবু তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় এক চরম সুন্দরভাবে। এই সর্বত্র বিরাজমান সত্যতা, যাকে আমাদের সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় না, তাকেই বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি না। প্রাথমিকভাবে কেবল একটা বিশ্বাস থাকে মাত্র এই সর্বত্র বিরাজিত সত্য সম্পর্কে।

এই সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য সচ্চিদানন্দ বা সৎ (Being) এর বিভিন্ন স্তর অথবা তন্ত্রীগুলিকে জানা প্রয়োজন—যেভাবে তাদের উপলব্ধি করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তবে মনে রাখা প্রয়োজন তিনি সৎ এর বিভিন্ন স্তর এর কথা বললেও 'সত্যতার প্রকৃতিতে বহু' একথা বলেন নি। তাঁর মতে, সত্যতা আবশ্যকীয় ভাবেই এক কিন্তু সৃষ্টি নির্ভর করে দ্বিমুখী তত্ত্বের ওপর, তাহল একত্ব এবং বহুত্ব। সৃষ্টি হল সত্যতার একত্বের আবশ্যকীয় প্রকাশ।

শ্রী অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে আটটি তত্ত্বের কথা বললেন। এগুলি হল শুদ্ধ সত্ত্বা, চিৎশক্তি, পরম সুখ, অতিমানস, মানস, মন (Psyche), জীবন ও জড়। প্রথম চারটি উচ্চ গোলার্দ্ধে এবং শেষ চারটি নিম্ন গোলার্দ্ধে অবস্থান করে। তিনি চরম সত্যতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, 'সচ্চিদানন্দ' বলে। অস্তিত্ব, চৈতন্য-শক্তি এর পরম সুখ - এই তিন এর সম্মিলিত নামই সচ্চিদানন্দ।

শ্রী অরবিন্দের মতে, সচ্চিদানন্দই সকল কিছুর উৎস। তিনি নিশ্চেতনার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে স্বরূপে যাবার জন্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন। প্রাণ তারই চিৎশক্তির নিম্ন আংশিক প্রকাশ, মন তাঁরই সৃজনীশক্তি অতিমানসের প্রতিরূপ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হতেই যে জড়ের উৎপত্তি তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। দেহ, প্রাণ, মনকে ত্যাগ করে যে সার্থকতার সন্ধান করা হয়। তা চরম সার্থকতা নয়, এতে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় - সমস্যার সমাধান হয় না। দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, কিন্তু তা পরম সত্য হতে পারে না। এই সব দ্বন্দ্বের মিলনেই পরম সত্য।

এই সচ্চিদানন্দই নিজের সত্তাকে পদার্থ, শক্তিকে রূপ, চিৎকে আত্মপ্রকাশ, নিজের আনন্দ নিজের কাছে অর্ঘদান - এইভাবে নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করছেন। সচ্চিদানন্দ মানসিক স্তরে নিজের মানস চেতনায় জ্ঞান, ক্রিয়া ও আনন্দের বিষয় হবার জন্য বিষয়ের ভিত্তি হিসাবে নিজেকে জড় করেছেন।

**ক) শুদ্ধ সত্তা (Pure Existence):**

শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'শুদ্ধ সত্তা' হল সামান্য এবং অসীম শক্তির আধার'। তিনি বলছেন, যখন আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে জগৎকে দেখি আবেগমুক্ত কৌতূহল নিয়ে, তখন আমরা অনুভব করি আমাদের সামনে এক অসীম শক্তির আধারকে - যা তার অসীম কার্যধারাকে প্রকাশ করে থাকে সীমাহীন 'স্থান' এবং শাশ্বত 'কাল' এর মধ্য দিয়ে। এই 'শুদ্ধ সত্তা' আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে অতিক্রম করে যায়, অথচ অজ্ঞতাবশতঃ আমরা মনে করি আমাদের চাহিদা ও স্বার্থপূরণের জন্যই এই বিপুল কর্মধারার অস্তিত্ব।

কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করলে আমাদের উপলব্ধি হবে যে, মানুষের ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা



পূরণের দিকে এর কোন লক্ষ্য নেই। নিজের বিশাল লক্ষ্য সাধনের জন্যই এর গতি নিজের টানে নিজে চলছে। তবে মানবজীবনের সঙ্গে যে এর কোনও সম্পর্ক নেই - এমন ভাবাও ভুল। যখন আমাদের উপলব্ধি হবে যে, এই অনন্ত শক্তির মানসোত্তর চেতনা অবিভক্ত হয়েও বৃহৎতম থেকে ক্ষুদ্রতম - সর্ববিষয়ে সমগ্রভাবে বিরাজিত, যখন আমরা বুঝব যে আমরা এই অনন্ত গতির এক অংশমাত্র, এই অনন্তকেই জেনে এর সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করা আমাদের প্রয়োজন, তখনই আমাদের প্রকৃত জীবনের সূচনা হবে।

এভাবে দার্শনিক অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে আমরা পেতে পারি শুদ্ধ সত্তার আভাস। এই সত্তা অসীম এবং অবাধ, 'স্থান' এবং 'কাল' এর দিক থেকে নয়, বরং এক্ষেত্রে 'স্থান' এবং 'কাল' এর প্রশ্নই ওঠে না। এই ধারণার একটি সুবিধা হল 'আমি' এবং 'অন্যরা' এই দ্বৈত ভাবনার থেকে উর্দ্ধে ওঠার চেতনা দেয় আমাদের এবং এই সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা প্রথম অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করি। এভাবে শুদ্ধ সত্তাকে দেখলে স্থান-কাল অদৃশ্য হয়ে যায়, আর স্থান-কাল অদৃশ্য হলে তাদের কারণে যে দ্বিত্ব তাও অদৃশ্য হয়।

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন, এই 'শুদ্ধ সত্তা'কে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, বস্তুতঃ শুদ্ধ বৌদ্ধিক পদ দ্বারাও এই শুদ্ধ সত্তা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এটি অনির্বচনীয়, অসীম, দেশকালাতীত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বয়ংপূর্ণ অস্তিত্ব। একে কোন এক পরিমাণ অথবা পরিমাণসমূহের যোগফল যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন এক গুণ অথবা গুণসকলের যোগফলও বলা যায় না। একে কোন আকৃতি অথবা আকৃতির আধারের যোগফলও বলা যায় না। যদি সমস্ত পরিমাণ, গুণ এবং আকৃতি অদৃশ্যও হয়ে যায় তবু এই শুদ্ধ সত্তা থেকে যাবে।

প্রথম দৃষ্টিতে জগৎকে চঞ্চল অস্থায়ী বলেই মনে হয়, যা স্থির শান্ত তাও চঞ্চল বা বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি মাত্র। কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করলে শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা আমাদের উপলব্ধি হবে যে অনন্ত গতির পশ্চাতে অনন্ত শান্ত বিদ্যমান। শক্তি এক সত্তারই ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়া বললেই নিষ্ক্রিয়তার বোধ হয়। সত্তা হল শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সত্তাই সকল ক্রিয়ার ভিত্তি।

এই শাশ্বত শান্ত সত্তাকে যে আমরা শুধু উপলব্ধি করতে পারি তা নয়, আমরা এর মধ্যে অবস্থান করতেও পারি। সুতরাং শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে যা সত্য বলে মনে হয়, উপলব্ধির দ্বারা তার সত্যতা আরও দৃঢ় হয়। এটাই শুদ্ধ, শাশ্বত, অনির্বচনীয় ও অনন্ত সত্তা, এটি দেশ-কাল, রূপ, গুণের অতীত, স্বয়ম্ভু, নিরপেক্ষ আত্মা। এই শুদ্ধ সত্তা মানসিক প্রত্যয় মাত্র নয়—বাস্তব সত্য, এটাই মূল সত্য। কিন্তু গতিও সত্য, গতি অলীক নয়।

সুতরাং আমরা দুটি মূল সত্য পাই - সত্তা ও গতি। যেমন তিনি এক এবং বহু, এ সবের উর্দ্ধে, তেমন তিনি সত্তা, গতি এবং এ দুয়ের উর্দ্ধে। কিন্তু তাঁর এই অনির্বচনীয় অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলে আমাদের বলতে হয় যে তিনি সত্তা ও গতি উভয়ই। তিনিই শিব ও কালী, তিনি দেশ কালাতীত শুদ্ধ সত্তা, আবার তিনিই অনন্ত দেশকালের মধ্যে অনন্ত শক্তির ক্রিয়া।

**খ) চিৎ - শক্তি (Consciousness - force):**

শ্রীঅরবিন্দের চিৎ-শক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি মূল প্রশ্ন দেখা দেয়—এক : 'শুদ্ধ সত্তা'র সঙ্গে 'গতি'র সম্বন্ধ কেমন? এবং দুই : এই গতির প্রকৃতি কেমন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সত্তা ও গতি - একই সত্যের দুই দিক মাত্র। সত্তা ও গতি

অভিন্ন, সত্তার মধ্যেই গতি নিহিত, আবার গতির ভিত্তিই হল সত্তা। যেমন শিব ও কালী, ব্রহ্ম ও শক্তি একই, বিচ্ছিন্ন দুই শক্তি নয়। শক্তি 'স্থির' হয়েও থাকতে পারে, আবার 'চঞ্চল'ও হতে পারে। 'শক্তি' এমন কিছু নয় - যা সত্তায় পূর্বে ছিল না, বাইরে থেকে এসেছে। সত্তার মধ্যে শক্তি আত্মকেন্দ্রীভূত হয়ে স্থির থাকতে পারে, আবার আত্মপ্রকাশের ধারায় বিচ্ছুরিত হতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন শক্তি আত্মসমাহিত অবস্থা থেকে প্রকাশের ধারায় ক্রিয়াশীল হয়? কেন শক্তি চিরদিন আত্মসমাহিত রূপেই অবস্থান করে না? যদি সত্তাকে অচেতন বলা হয়, তাহলে এই প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু সত্ত চিন্ময় হলে প্রশ্নটি যথোচিত আলোচনা যোগ্য। কেননা যদি বলা হয় যে, শক্তি বাইরে থেকে পুরুষকে প্রকাশে বাধ্য করে, তাহলে যখন পুরুষ শক্তির অধীন হয়ে পড়ে, তখন 'পুরুষ' আর নিরপেক্ষ থাকে না, সেক্ষেত্রে 'পুরুষ' ও 'শক্তি'তে বিচ্ছেদ আসে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যে 'সত্তা' ও 'শক্তি' এক ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং আমাদের জানা প্রয়োজন 'চিৎ' এর প্রকৃত অর্থ কি?

'চেতনা' বলতে আমরা সাধারণতঃ মানুষের জাগ্রত চেতনাকে শুধু বুঝি। নিদ্রা বা মূর্চ্ছার অবস্থাকে বাদ দিই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চেতনা এত সংকীর্ণ নয়। নিদ্রিত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমাদের চেতনা যে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। জাগ্রত চেতনা আমাদের চেতনার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এর পশ্চাতে আছে আমাদের সমগ্র মগ্ন-চেতনা ও অবচেতনা - এগুলিই মানবসত্তার অধিক অংশ।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যাকে আমরা জড় বা নিশ্চেতন বলি, সেখানেও চেতনা সুপ্তভাবে বর্তমান। যেমন মানুষকে নিদ্রিত অবস্থাতেও চিৎ সম্পন্ন বলা হয়। এই 'চিৎ'ই জগৎস্রষ্টা। চিৎ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, চিৎ সকল কিছুর আধার ও কারণ। যে মহতী চিৎশক্তি সর্বত্র ক্রিয়াশীল, মানবচেতনা তারই একাংশ মাত্র। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী - সকল কিছুতেই চিৎশক্তি বর্তমান ও সক্রিয়। উপস্থিত মানবমন এর পূর্ণতর বিকাশমাত্র। কিন্তু এই মানবচেতনারও উর্দ্ধে এর বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ এতো জগৎস্রষ্টা পুরুষেরই শক্তি। সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশই এই জগতের লক্ষ্য ও পরিণতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ গতির প্রকৃতিটি কেমন? এমন প্রশ্ন ও গুরুত্বপূর্ণ। এই 'গতি' কি অচেতন শক্তি? কিম্বা বুদ্ধিহীন শক্তি? একে কি রাসায়নিক (Chemical) গতি বলা যায় অথবা এটি সচেতন শক্তি? শ্রী অরবিন্দ বিনা দ্বিধায় বলেছেন, এই গতি সচেতন গতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে গতি যে সচেতন সে কথা প্রমাণ করেছেন, আবার একথাও বলেছেন ঐ চেতনাই গতি।

তাঁর মতে, এই সচেতন-গতিই চিৎ শক্তি যা সমস্ত সৃষ্টির মূল। এঁকে তিনি 'মা' বলেছেন এবং এই ঐশ্বরিক শক্তিই জগতের সৃষ্টি এবং ধাত্রী সমস্ত কিছুর মূল। এভাবে জগতের সৃষ্টিশক্তি রূপে একটি চেতনশক্তিকে স্বীকার করে শ্রীঅরবিন্দ জগৎ সম্পর্কে 'অচেতন উদ্দেশ্যবাদ' (Unconscious Teleology) এর তত্ত্বকে অস্বীকার করতে সমর্থ হয়েছেন। যে মুহূর্তে তিনি সৃষ্টিশীল শক্তিকে চেতন বলে উপলব্ধি করছেন, তখন আর এই জগৎ-এর উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, নিয়মকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকে না।

**গ) অসীম সত্তার আনন্দ (The Delight of Existence, Bliss):**

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অসীম সত্তা শুধুই চিৎ এবং চিৎ নয়, তাকে 'আনন্দ'ও বলা যায়। বেদান্তের উপলব্ধি এই যে ব্রহ্ম শুধু চিন্ময়সত্তা নন, তিনি আনন্দঘনও। এক চিন্ময় শুদ্ধ সত্তা



অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ হয়, তবে প্রশ্ন হতে পারে, এই অনন্ত নিরপেক্ষ পূর্ণ ব্রহ্মের কোন অভাব বা প্রয়োজন নেই। কোন কিছুর জন্য কামনা নেই, তবে কেন তাঁর চিৎশক্তি বহুরূপে প্রকাশিত হল? যদি উত্তরে বলা হয়—বহুরূপে প্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টিই তাঁর স্বভাব, তাহলে উত্তরটি সঠিক হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়, ব্রহ্ম স্বাধীন নন-আপন স্বভাবের অধীন, তিনি নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না। প্রকাশিত না হবার শক্তি তাঁর নেই। এও এক প্রকার অপূর্ণতা, সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

তাই শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, 'আনন্দ'কেই সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলা যায়। এই আনন্দ থেকেই এই জগতের জন্ম। এক্ষেত্রে প্রাচীন বেদান্তের সৃষ্টির ব্যাখ্যাকে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এই সৃষ্টিকে শিবের পরম আনন্দদায়ক নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, নৃত্যের আনন্দই যেমন নৃত্যের উদ্দেশ্য, তেমনি এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কেবল আনন্দই। এই আনন্দ আত্মপূর্ণতারই নামান্তর। সুতরাং সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ - সৎ, চিৎ ও আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ।

স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 'অমঙ্গল' (Evil) প্রসঙ্গে। যদি এই জগৎ ব্রহ্মের আনন্দেরই প্রকাশ হয়, যদি ব্রহ্ম সৎ,চিৎ ও আনন্দেরই সমাহার হন, তবে এই জগৎ-এ 'দুঃখ' ও 'অমঙ্গল' রয়েছে কেন? জগতে এই দুঃখ ও অমঙ্গলের উপস্থিতি প্রমাণ করে, হয় ব্রহ্ম এই দুঃখ ও অমঙ্গলকে রোধ করতে অক্ষম, না হলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলিকে জগতে রেখেছেন। যদি ব্রহ্ম দুঃখ ও অমঙ্গলকে রোধ করতে অক্ষম হন তবে তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন, আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি মানব জীবনে দুঃখ ও অমঙ্গল দিয়ে থাকেন তবে তিনি 'মঙ্গলময়' নন।

শ্রীঅরবিন্দ অমঙ্গল ও দুঃখের উপস্থিতির প্রসঙ্গে এ জাতীয় যৌক্তিক প্রশ্ন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, ব্রহ্মকে জগতের বাইরে ভাবার জন্যই এ জাতীয় যুক্তি আমাদের মনে আসে। তিনিই সব কিছু। তিনিই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন। সুতরাং, তিনি জীবকে কষ্টের মধ্যে কেন ফেললেন? এ প্রশ্ন ঠিক নয়। কেন তিনি সচ্চিদানন্দ হয়ে নিজেকে নিরানন্দের মধ্যে ফেললেন, কিভাবে তাঁর মধ্যে দুঃখ, কষ্ট, অন্যায়, অশুভ এল - এটাই মূল প্রশ্ন।

শ্রী অরবিন্দের মতে, নীতিধর্ম মনুষ্য সৃষ্ট। জড়জগতে বা নিম্ন প্রাণীর মধ্যে নীতির বালাই নেই। ঝড় বা আগুন যে ক্ষতি করে, প্রাণী প্রাণীকে যে বধ করে, তার জন্য ঝড়, আগুন, বাঘ-সিংহকে কেউ নিন্দা করে না। মানব সমাজের উচ্চস্তরে ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বোধ আসে। মানুষ আনন্দের জন্য আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রসার চায়। তাতে বাধা এলেই সে এই বাধাকে অন্যায়, অশুভ মনে করে। আর যা তার আত্মপূর্ণতার সহায়-তাকেই সে 'ন্যায়সম্মত' ও 'শুভ' বলে। তবে মানবভেদে আত্মপ্রকাশের অর্থেরও ভেদ হয়। একজনের কাছে যা আত্মপ্রকাশ, অন্যের কাছে তা বিপরীত হতে পারে।

সুতরাং অর্থের তারতম্যের জন্য কোনটি একজনের কাছে ন্যায়সম্মত হলেও অন্যজনের কাছে তা অন্যায়। সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা পাপ না হলেও, হত্যাবিরোধী ন্যায় নিষ্ঠের কাছে তা অত্যন্ত অন্যায়। তাই ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম বোধ অত্যন্ত আপেক্ষিক। মানবস্তরে যে ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, আরও উচ্চস্তরে উঠলে সে বোধ আর থাকে না। যেমন মানব চেতনার নিম্নস্তরে নীতির প্রশ্ন নেই। সেইরকম বর্তমান মানব চেতনার উর্দ্ধস্তরেও নীতির

প্রশ্ন থাকবে না। সেখানে বাধাবিঘ্ন এসব থাকবে না। সকলই আনন্দের অভিব্যক্তি। সুতরাং ন্যায়-অন্যায়ও থাকবে না। কিন্তু এই আনন্দ মানব অভিজ্ঞতার সুখ নয়। যেমন চিৎ বলতে শুধু মানব চেতনা বোঝায় না, সেইরকম আনন্দের অর্থ মানবীয় সুখ বোধের থেকেও ব্যাপক। এই আনন্দ কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। এ সার্বিক, অসীম ও স্বয়ংস্থ। জড়, প্রাণ ও মনের মধ্য দিয়ে আনন্দের অভিব্যক্তি হচ্ছে। মানব চেতনাতে এই অভিব্যক্তি আংশিক মাত্র, কামনা বাসনা দুষ্ট ও বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দিব্য চিৎশক্তির প্রভাবে অহমাত্মক কামনা বাসনা দূর হলেই পূর্ণ দিব্য আনন্দের আবির্ভাব হবে। সত্য সুখের পরিবর্তে আসবে অমৃতময় আনন্দ।

**সৃষ্টির প্রকৃতি : জাগতিক প্রক্রিয়া** (Nature of Creation : The World-Process):

সৃষ্টির প্রকৃতি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দুটি পদ্ধতির কথা বলেছে। প্রথমতঃ এই পদ্ধতি হল স্বরূপে অবস্থিত 'সত্তা'র জাগতিক আকারে অবরোহন (Descent)। এইপর্বে বিশ্বের গতি অধোমুখী। তারপর আবার বিকাশ উর্দ্ধমুখী অর্থাৎ তখন তা স্বরূপে অবস্থিত সত্তার দিকে অগ্রসর হয়। এই পর্বকে তিনি বলছেন আরোহণ (Ascent)। এই পদ্ধতিকে সংকোচন (involution) এবং বিবর্তন (evolution)ও বলা হয়েছে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বৈদান্তিকদের মতই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তবে 'পদ' এবং ধারণাগুলি তাঁর অন্তর্দর্শনের সাক্ষ্য বহন করে। বেদান্তে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা হয় 'অবিদ্যার ফল' হিসাবে। আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ আমরা মনে করি এই জগৎ সত্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবের অস্তিত্ব সত্য। সত্যের প্রকৃত স্বরূপকে অজ্ঞানবশতঃ না জানার ফলেই এটা ঘটে থাকে। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে কোন সৃষ্টি নেই। আর এই জগৎরূপে যা প্রতিভাসিত তা এক আনন্দময় খেলা মাত্র - লীলা।

শ্রীঅরবিন্দও বলছেন, চিৎসত্তার অজ্ঞানতার গর্ভে নিমজ্জন। তবে এই 'অজ্ঞানতা' আলাদা কোন শক্তি নয়—এটি ঐশ্বরিক চেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি ঐশ্বরিক জ্ঞানের নঞর্থক দিকও নয়। বস্তুতঃ এক চরম প্রান্তে রয়েছে পরম ঐশ্বরিক চেতনা এবং অপর চরম প্রান্তে রয়েছে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। এই সৃষ্ট জগতের মূলে যে অজ্ঞানতা (Ignorance) তা রয়েছে এ দুয়ের মাঝখানে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে স্বাভাবিকভাবেই, কেন অসীম অজ্ঞানতা থেকে সৃষ্টি করাকে নির্বাচন করলেন? তিনি কি 'জ্ঞান' থেকে সৃষ্টি করতে পারতেন না। এবং যদি তিনি অবশ্যই সৃষ্টি করে থাকেন অজ্ঞানতা থেকে, তবে তার শক্তির সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হচ্ছে না কি? শ্রী অরবিন্দ সচেতন ছিলেন যে এ জাতীয় সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই তিনি বলছেন, অসীম পূর্ণতা থেকে, আত্ম-জ্ঞান থেকে সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু সেই সৃষ্টি কেবল উচ্চস্তরের সৃষ্টি, এক বৃহত্তর জগতের সৃষ্টি - যা কেবল মুনি-ঋষিরা দেখতে ও অনুভব করতে পারেন। সৃষ্টির প্রশ্ন সাধারণতঃ দেখা দেয় এই ক্ষুদ্র জগৎ সম্পর্কে - যে জগতে আমরা বাস করি, বিচরণ করি। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে অজ্ঞানতা বা অচিতি থেকে। জগত সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক করে। কারণ বেদান্তে এই জগতকে বলা হয় মিথ্যা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই জগতকেও সত্য বলে মর্যাদা দিয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তার 'মায়া' সম্পর্কিত বক্তব্য আমাদের জানা প্রয়োজন।



**মায়া এবং লীলা** (Maya and Lila):

বস্তুতঃ এই শব্দ দুটি 'কিভাবে' এবং 'কেন' জগৎ সৃষ্টি তার উত্তর দেয়। যদি প্রশ্ন হয় কেন সৃষ্টি হয়েছে জগৎ? উত্তর হবে, চিৎ পুরুষের লীলার জন্য। যদি প্রশ্ন হয় কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? তবে উত্তর হবে, মায়ার দ্বারা। যদিও আপাতভাবে এর থেকে মনে হতে পারে এটি তো বেদান্তেরই উত্তর। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ঠিক বেদান্তের মত করে বিষয় দুটিকে ব্যাখ্যা না করে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রী অরবিন্দের মতে, সৃষ্টি আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, আনন্দই হল অস্তিত্বের কারণ, আনন্দই জন্মের শেষ। উপনিষদ বলে—আনন্দ থেকেই সমস্ত সত্তার জন্ম আনন্দের দ্বারাই বৃদ্ধি, আনন্দের সঙ্গেই নিষ্ক্রমণ। তাই বলা যায় সৃষ্টি এক আনন্দের খেলা - লীলা মাত্র। যে জগতের আমরা অংশ, সেই জগত আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় 'গতি' রূপে আবার এই 'গতি' আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় সচেতন সৃষ্টিশীল হিসাবে যা নতুন নতুন আকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা এই গতির উদ্দেশ্য এবং এইসব আকৃতির কারণ বোঝার চেষ্টা করি, তখনই আমাদের উপলব্ধি হয় এই মহা জগতের ছন্দকে — যা আনন্দেরই প্রকাশ। আর তখনই আমরা এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি। জগৎ পদ্ধতির এই আনন্দকেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলা যায় লীলা।

'দিব্যজীবনে' (পৃ.৯৪) তিনি বলছেন, '...জগৎ সত্তাকে যদি জানি শাশ্বত সম্রাজের স্বরূপানন্দের ভূমিকায় রেখে, তাহলে তাকে দেখব বলব ও অনুভব করব লীলা বলে। নিখিলের 'বন্ধুরাত্মা' যে চিরকিশোর, এ বিশ্বলীলায় তিনিই 'শিশু ভোলানাথ'। তিনিই নটরাজ, তিনিই কবি, তিনিই দ্রষ্টা - তাঁরই অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস হিল্লোলিত হয়ে চলেছে রূপে রূপে। আত্মরূপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজের মধ্যেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি, অক্লান্ত ছন্দোলীলায়। এ আনন্দ মেলায় তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ।'

'মায়া' সাধারণত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থে এটি শক্তি বিশেষ, গঠনমূলক এবং সৃষ্টিমূলক, আর দ্বিতীয় অর্থে ভ্রম সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া বিশেষ। শ্রীঅরবিন্দ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেননি। কেননা তাহলে এই জগতের অবস্থান ভ্রমাত্মক হয়ে যাবে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন এই জগৎ অসত্য নয়, এমনকি যদি এটি স্বপ্নও হয়, তবে সেই স্বপ্নও সত্যি। তাই বলা যায় শ্রীঅরবিন্দ 'মায়া'র প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। যেখানে বলা হচ্ছে মায়া হল এমন শক্তি যা জগৎ সৃষ্টি করেছে, যা সচ্চিদানন্দের শক্তি হিসাবে অসীম সত্তার আকৃতিগুলিকে প্রকাশ করছে। একে 'দিব্য মায়া' বলা যায়। এখানে সকলকে 'সকল' বলেই জানা যায়, কোন বিভেদক চেতনা থাকে না। যেখানে প্রত্যেকের সকলে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেকে থাকে, যেখানে সত্তার সঙ্গে সত্তা থাকে, চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্য, গতির সঙ্গে গতি, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ।

**আরোহণ অথবা বিবর্তন** (Ascent or Evolution):

শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, বিবর্তনের প্রাক অবস্থা 'কুণ্ডলীকরণ' (involution)। বস্তুতঃ বিবর্তন সম্ভব হয় কারণ কুণ্ডলীকরণ ইতিমধ্যেই ঘটেছে: এই দুই পদ্ধতির মধ্যেই যুক্ত আছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্ম শক্তি প্রথমে জড়, প্রাণ এবং মনে অবরোহণ (discent) করেছে তারপর আবার আরোহণ করবে উচ্চ স্তরে। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, কেননা প্রাণ,

জড়ের মধ্যে সুপ্ত আছে, প্রাণ, মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। কারণ প্রাণের মধ্যে মন সুপ্ত ছিল। শ্রীঅরবিন্দের মতে, শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়।

শ্রীঅরবিন্দের বর্ণিত 'বিবর্তন' একটি বিশিষ্ট চরিত্রের যার সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাবিদদের বিবর্তন ভাবনার কোন মিল নেই। কেউ পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ উন্মেষমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ যান্ত্রিক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ বা আবার উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনের কথা বলেন। পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তন বলে, বিবর্তন হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম-বেশি একই আকৃতি ও বিষয়ের পুনঃসংগঠন মাত্র। এ জাতীয় বিবর্তন একই সত্তার পুনরাবৃত্তিমাত্র। এর বিপরীত তত্ত্ব উন্মেষমূলক বিবর্তন। সেখানে বিশ্বাস করা হয়, বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছু উদ্ভব হয়। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে, পূর্ববর্তী শর্তের ভিত্তিতে আর উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদে বলা হয় বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব হল 'অখণ্ড বিবর্তনবাদ' (Intergral Evolution)।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের বৃদ্ধি ঘটে ত্রিবিধ পদ্ধতিতে। এগুলি হল প্রশস্তকরণ (widening), উন্নতিবিধান করা (leightening) এবং অখণ্ড সমন্বয়করণ (integration), এই পদ্ধতিতে কোন কিছুকেই সম্পূর্ণ বাতিল করা হয় না। সব কিছুকেই পরিণামে অখণ্ডভাবে যুক্ত করা হয়। প্রশস্তকরণ পদ্ধতির অর্থ হল নতুন তত্ত্বের জন্য আরো সুযোগ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি উন্নতিবিধান করার অর্থ এক ধাপ থেকে আর এক উন্নত ধাপে আরোহণ। কিন্তু বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল অখণ্ডতা।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের দুটি ধারা। একটি হল জন্মচক্রের মাধ্যমে বাহ্য শরীরের উন্নতি, অন্যটি অন্তঃস্থ পুরুষের ক্রমবিকাশ। ক্রমবর্ধমন চেতনার জন্য শরীরেরও উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। একদিকে চেতনার উন্নতি হচ্ছে, অন্যদিকে তার উপযোগী শরীরের বা আধারের সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেই পরিণামে জড় হয়ে উঠবে পরম চিৎপুরুষের পূর্ণ অভিব্যক্তির যোগ্য বাহন।

তাঁর বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উঠেছে। সেগুলি এই রকম:

১) বলা হয় যে চেতনার সপ্ত পর্যায়। জড়ের মধ্যে চিৎপুরুষের অধিষ্ঠান এবং সেখান থেকে এর পুনরুত্থান, জীবের পুনর্জন্ম প্রকৃতিস্বীকার করলেও, জীবের উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। আর সচ্চিদানন্দ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের জন্য, লীলার জন্য। নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে না, কেননা তাঁর কোন অভাব নেই। তাই বিবর্তনের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২) শ্রীঅরবিন্দ যেমন মনে করেন, সেইরকম জড়ের পরে প্রাণের এবং প্রাণের পরে মনের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মনের পর যে অতিমানসের আবির্ভাব হবেই - তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, এই জন্যই যে, মন অপরার্ধের শক্তি, অথচ অতিমানস পরার্ধের শক্তি। অতিমানস উচ্চস্তরের শক্তি হয়ে কেন এবং কিভাবে নিম্নস্তরে মনের মধ্যে নেমে আসবে?

৩) আধুনিক বিজ্ঞান যদিও বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে, কিন্তু বিজ্ঞানের এই কথাই যে চরম সত্য এমন বলা যায় না, কারণ এমন অনেক বিষয় আছে, যাকে বিজ্ঞান এককালে সত্য বলতো, কিন্তু বর্তমানে তাদের মিথ্যা বলছে।

৪) জগতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশীল জীবের স্বধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। মানুষেরও নিজের 'স্ব-ধর্ম' আছে। স্বধর্মের মধ্যে মানুষ উন্নতি করতে পারে। কিন্তু স্বধর্মকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে



অসম্ভব। অতিমানব হয়ে দেবত্ব লাভ করা যেহেতু তার স্বভাব বিরুদ্ধ—তাই অসম্ভব।

এই আপত্তিগুলির উত্তর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে দিয়েছেন এভাবে: প্রথম আপত্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টির পেছনে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই—কেবল এক অচেতন শক্তির ক্রিয়া এই জগৎ। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, সৃষ্টির প্রতি বিষয়ের মধ্যে এতো জটিল ও সুনিপুণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা রয়েছে, যাকে আকস্মিক সমাবেশের ফল বলা যায় না। গূঢ় চিৎপুরুষের সংকেতের দ্বারাই কেবল এটি সম্ভব হতে পারে। জগৎ সৃষ্টি শুধু লীলা বা আনন্দের জন্য হলেও এই লীলার একটা উদ্দেশ্য আছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে জগৎ অবিদ্যাময়। সেখানে মনের পর অতিমানসের আবির্ভাব যে হবেই - তার নিশ্চয়তা কি? কারণ উচ্চস্তরের অতিমানস কিভাবে নিম্নস্তরের মধ্যে অবতরণ করবে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জগতের উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা নয়। সচ্চিদানন্দ নিজেই নিশ্চেতনার মধ্যে নেমেছেন এবং তাঁর দিব্যজ্ঞান সংকুচিত ও আবৃত হওয়াতেই অবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। নিমজ্জিত দিব্যজ্ঞান আবার ক্রমপ্রকাশিত হয়ে পূর্ণজ্ঞানের পথে চলেছে। মানুষের অবিদ্যা হল নিশ্চেতনা ও দিব্যজ্ঞানের মধ্যবর্তী অবস্থা। এটি দিব্যজ্ঞানের সংকুচিত রূপ ঠিকই, কিন্তু মূলতঃ দিব্যজ্ঞান, মানসচেতনার উর্দ্ধে আরও যেসব চেতনার পর্যায় আছে, তাদের শক্তির প্রভাব মানব চেতনায় আসে মানুষও কখনও কখনও অলৌকিকভাবে এদের কথা জানতে পারে। এই সব শক্তি ও অতিমানসও প্রচ্ছন্নভাবে জগতের মধ্যে সক্রিয় থেকে বিবর্তনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রাণ ও জড়ে যেমন মনের আবির্ভাব হয়েছে, মনেও সেইরকম অতিমানসের আবির্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়—অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় আপত্তি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরুদ্ধে, এই বিষয়টিকেও শ্রী অরবিন্দ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞান বাইরের আকার পরিবর্তনের কথাই শুধু বলে, কিন্তু মূল কথা অন্তর্নিহিত চিৎ-শক্তির ক্রম-প্রকাশ। চেতনার জন্যই আকার সৃষ্টি, আকার চেতনার আধারমাত্র। বাইরের দিক থেকে দেখা যায় যে ধীরে ধীরে বিষয়সমূহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং আকার যতই উন্নত, জটিল ও সুগঠিত হচ্ছে, ততই উন্নততর চেতনার আবির্ভাব হচ্ছে। এর কারণ হতে পারে যে দিব্য চিৎ-শক্তি পর পর নূতন আকার ও নূতন চেতনা সৃষ্টি করে চলেছে, কিম্বা পূর্বের বিষয় থেকেই পরের বিষয়ের আকার ও চেতনা গূঢ়ভাবে গঠন করছে, যেমন জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে মন এসেছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আকস্মিকভাবে নয়, বিষয়সমূহের চেতনা ও আকার ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, নিম্ন প্রাণীচেতনা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে যখন উচ্চ প্রাণীচেতনায় উপনীত হয় - তখন এটি অনেক দিক থেকেই মানব চেতনার অনুরূপ। সেই পর্যায় থেকে মানব চেতনা ও তদুপযোগী দেহের আবির্ভাব হয়েছে। এই তথ্যই সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

চতুর্থ আপত্তির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, একথা সত্য যে বিষয়সমূহ আপন আপন জাতির ধর্ম পালন করে মানুষও স্বধর্ম পালন করবে। কিন্তু অন্য সব থেকে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে সে সর্বদাই চায় নিজের গণ্ডী অতিক্রম করতে —এটাই তার প্রকৃত স্বধর্ম। মানুষের স্বভাব হল নিম্ন থেকে উচ্চে আরোহণের আস্পৃহা। একথা ঠিক যে মানবজাতির অগ্রগতি একটানা হয়নি, সে কখনও ওপরে উঠেছে, কখনও নিচে নেমেছে। কিন্তু মানব তার শক্তিকে আরও তীক্ষ্ণ ও

সাবলীল করে নূতন নূতন বিষয়ে প্রয়োগ করেছে। চিন্তা ও ভাবের উৎকর্ষে সে হয়তো মহান পূর্বসূরীদের সব সময় অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা সে প্রাচীন যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগে রাষ্ট্র, সমাজ, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়ে নানা ভাবনার অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন তত্ত্বে আমরা দেখতে পাই যেমন মহাজাগতিক বিবর্তন তেমনি ব্যক্তির বিবর্তন। বিবর্তন, তাঁর মতে, যেমন জাগতিক, তেমনি ব্যক্তির হবেই। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিই হল আধার, যার মাধ্যমে চিৎশক্তি তার সত্তাকে প্রকাশ করবে। সুতরাং ব্যক্তির আরোহণ কেবল প্রতীকী নয় বরং তা জাগতিক বিবর্তনকে সাহায্য করে, দ্রুত করে। এটাই শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড বিবর্তনের মূলকথা।

মানব প্রকৃতি (Nature of Man):

শ্রীঅরবিন্দের মতে, যে 'মানুষ'কে আমরা জানি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সামনে প্রকাশিত, সে 'প্রকৃত মানব' নয়, অন্ততঃ তাকে 'পরিপূর্ণ মানব' বলা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের প্রকৃত সত্তাকে জানার ক্ষমতা নেই। আমরা নানা অংশ দিতে গঠিত, প্রত্যেকটিই আমাদের চেতনায় কিছু না কিছু সংযোজন করে; ফলে আমরা অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ভ্রমে পড়ি।

মানুষের দুটি দিক। একটি বাহ্যিক, অপরটি আন্তরিক। বাহ্যিক দিকটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, এটাই আমাদের সত্তার জাগ্রত-চেতনা, আমাদের চেতনার। অবচেতন দিকও আছে— যেখানে রয়েছে নানা পূর্বতন সংস্কার, বদ্ধমূল ধারণা, অভ্যাসগত প্রতিক্রিয়া—যা আমাদের অতীত থেকে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এগুলি আমাদের সত্তার আন্তরিক দিক নয়, বাহ্যিক অথবা উপরিস্থ চেতনা। এছাড়া আছে চৈত্য পুরুষ - এটাই কেন্দ্রীয় সত্তা।

বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দ এই কেন্দ্রীয় সত্তা বা অন্তর সত্তাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি উচ্চস্তর, অপরটি নিম্নস্তর। উচ্চস্তরটি 'জীবাত্মা' এবং নিম্নস্তরটি 'মনোময় সত্তা' বা চৈত্য পুরুষ। উচ্চস্তরটি হল মানুষের বিবর্তন পূর্ববর্তী, যা আরোহণ পদ্ধতিকে অতিক্রম করে যায়, কিন্তু নিম্নস্তর প্রকৃত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। এই দিকই বিবর্তন পদ্ধতির মধ্যে থাকে। যখন মানুষ এই জগতে থাকে - তাকে বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তার বাহ্যিক দিক এবং আন্তরিক দিক এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

জীবাত্মার মধ্যে দিব্যজ্ঞানের ঝলক রয়েছে, যেহেতু তা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মার মানব সংস্করণ হিসাবে এটি ব্যক্তি মানুষের জীবন ও মনের ব্যক্তিগত প্রকাশকে অতিক্রম করে যায়। অপরদিকে, মনোময় সত্তা হল জীবাত্মার সহকারী রূপে ব্যক্তি জীবনের প্রকাশক, অস্তিত্বজ্ঞাপক এবং সমর্থক। এই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মনোময় সত্তা বিবর্তন পদ্ধতির মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু জীবাত্মা বিবর্তন পদ্ধতির উর্দ্ধে। শ্রীঅরবিন্দ আরো একভাবে মানুষের এই দুই দিককে বিভাজন করেছেন। যেমন, তাঁর মতে, সব কিছুই হল দিব্যজ্ঞানের এক একটি প্রকাশ। মনোময় সত্তা এবং জীবাত্মা - উভয়ই দিব্যজ্ঞানের দুটি প্রকাশ, কিন্তু এঁদের সম্পর্ক হল 'মিল এর মধ্যে অমিল' (identity-in-difference)। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' শব্দের সঙ্গে এখানে শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার মিল রয়েছে। এখানে তৎ শব্দ মনোময় সত্তার কথা বলে, আর 'ত্বম' জীবাত্মারা দিব্য আত্মার কথা বলে।



এভাবে, আমরা বস্তুত মানুষের তিনটি দিককে দেখতে পাই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। প্রথমটি বাহ্য প্রকৃতি বা আত্মা, দ্বিতীয়টি অন্তর আত্মা বা চৈত্য পুরুষ, তৃতীয়টি দিব্য-আত্মা বা জীবাত্মা। প্রথমটির সঙ্গে যোগ আছে আমাদের দৈহিক প্রকৃতির। দ্বিতীয়টির হল মানব বিবর্তনের আধ্যাত্মিক দিক - যা পরিবর্তনযোগ্য, তৃতীয়টি হল দিব্য চেতনার সুপ্ত শক্তি। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে যোগ আছে শুধু বাহ্য আত্মার। চৈত্য পুরুষের সূক্ষ্ম আত্মা জন্ম-মৃত্যুর উর্দ্ধে। এর কাজ মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিবর্তন ঘটানো।

পুর্নজন্মের দর্শন এবং কর্মবাদ (Philosophy of Rebirth and the Law of Karma):

শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় দর্শনের 'পুর্নজন্ম এবং কর্মবাদ' এর পুরাতন মতবাদটি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেননি, এক্ষেত্রে তিনি মৌলিক ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও কিছু অংশে তাঁর 'পুর্নজন্ম ও কর্মবাদ' তত্ত্বটি প্রথাগত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে মিল আছে, তবু নানা দিকে শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর মতে পুর্নজন্ম হল বিবর্তনের সাধারণ পদ্ধতির একটি দিক এবং আরোহণের একটি সোপান। তিনি মনে করেন, আমরা বিবর্তনের পথে মনের স্তরে এসে পৌঁছেছি, এবং অপেক্ষা করছি পরবর্তী পদক্ষেপ অতিমানসের স্তরে উত্তরণের জন্য। বিবর্তন তত্ত্ব জড় থেকে প্রাণের মধ্যে দিয়ে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছেছে। স্বাভাবিকভাবেই 'জন্ম'কে বলা যায় একটি 'যান' বিশেষ অথবা পথ, যার দ্বারা বিবর্তন পদ্ধতির অগ্রগমন ঘটে।

পুর্নজন্মের প্রচলিত বিশ্বাসে নানা সমস্যা আছে। পুনর্জন্ম সাধনের কার্যপ্রণালীটি কেমন? মৃত্যুর পরই কি আত্মা মৃতদেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে অবিলম্বে প্রবেশ করে? অথবা অপেক্ষা করে কোথাও কোন আকারে নতুন দেহ ধারণ করার পূর্বে? ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে এই দুই প্রশ্নেরই উত্তর আমরা পাই। একদিকে, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জীব অন্য দেহে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে, পুরাতন ধর্মীয় বিশ্বাস হল, মৃত্যুর পর জীব তার মর্ত্য জীবনের পাপপুণ্য কাজের জন্য নরক বা স্বর্গে যায়, সেখানে আত্মা নিজের কাজের ফললাভ করে। যখন আত্মার পূর্ব জন্মের কাজের ফললাভ সম্পূর্ণ হয়, তখনই আবার দেহ ধারণ করে এই জগতে আসে।

শ্রীঅরবিন্দ বিস্তারিতভাবে এই সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখানেই প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, জীবাত্মার পুর্নজন্ম হয় না, পুনর্জন্ম হয় প্রকৃতির মধ্যে তার প্রতিভূ চৈত্যপুরুষের। প্রথম অবস্থায় এটি অপুষ্ট থাকে ক্রমশঃ জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এটি পুষ্টি লাভ করে এবং পুনর্জন্ম অতিক্রম করে স্বধামে অর্থাৎ নিজের উৎসে ফিরে আসে। এই দিব্য পরিণতি লাভই পুর্নজন্মের কারণ। প্রতি জন্মে চৈত্যপুরুষ জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য যা আবশ্যক তা গ্রহণ করে এবং অনাবশ্যক সব কিছু বর্জন করে নূতন দেহ গ্রহণ ও নূতন পার্থিব জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। এই সঞ্চয়, বর্জন ও প্রস্তুতির জন্য দুই জন্মের মধ্যে বিরতির প্রয়োজন।

এছাড়াও জগতের বিভিন্ন সব লোক পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকায়, উচ্চলোক সমূহ মানবের প্রাণ ও মনকে উর্ধে আকর্ষণ করে। এটাও বিরতি ও লোকান্তর গমনের অন্য এক কারণ। তবে যদি চৈত্যপুরুষ খুবই অপুষ্ট অবস্থায় থাকে, তাহলে এই আকর্ষণ কার্যকরী হবে না।

তখন দুই জন্মের মধ্যে কোন বিরামের প্রয়োজন থাকবে না। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুনর্জন্ম হতে পারে।

মধ্যবর্তী অবস্থায় জন্য লোকে থাকতে হলে চৈত্যপুরুষের এত উন্নত হওয়া প্রয়োজন যাতে সে মর্ত্যশরীরের ও মর্ত্যজীবনের আকর্ষণ কাটিয়ে সূক্ষ্মকোষেই আশ্রয় নিতে পারে, কারণ সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করেই চৈত্য-পুরুষ মন ও প্রাণ নিয়ে অগ্রগতির পথে চলে। উচ্চলোকের উপযোগী হবার জন্য সূক্ষ্মশরীরেরও যথেষ্ট পুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মানুষের প্রাণ ও মনের গঠনেও যথেষ্ট পুষ্ট দৃঢ়তা ও শক্তি আসা দরকার যাতে এরা স্থূলশরীরের আসক্তি কাটিয়ে উর্দ্ধে যেতে পারে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি প্রশ্ন আসতে পারে। পুনর্জন্ম যদি যুক্ত থাকে 'একক ব্যক্তি'র সঙ্গে, তবে তা কিভাবে জাগতিক উদ্দেশ্যকে সফল করবে? কিভাবে একজন একক ব্যক্তির পুনর্জন্মে প্রাপ্ত উন্নততর দেহ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয় আরোহণের সার্বিক পদ্ধতিকে? এককথায় জগতের সার্বিক বিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তির জন্মান্তর জনিত বিবর্তন কিভাবে যুক্ত? উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, বিবর্তন হয় যেমন জাগতিক, সেইরকম একক ব্যক্তিগত। আত্মা কেবল মানবতায় উত্তীর্ণ হয়েই তার কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে না। মানবতার পরও তার উচ্চ সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য কাজ করে যেতে হয়। তাই যদি বিবর্তনকে মানবিক স্তরের উর্দ্ধে উঠতে হয়, তবে তাকে সার্বিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিক থেকেই কাজ করতে হবে। বস্তুতঃ সার্বিক অথবা জাগতিক বিবর্তনের কোন গুরুত্বই নেই যদি না তা সংঘবদ্ধ হয় একক ব্যক্তিগত বিবর্তন পদ্ধতির সঙ্গে।

পুনর্জন্মের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে ও ধর্ম বিশ্বাসে যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে তার সঙ্গেও শ্রীঅরবিন্দের অভিমতের কোন মিল নেই। প্রচলিত ধারণায় বলা হয়, কামনা ও অজ্ঞানের জন্য জীবের জন্ম ও পুনর্জন্ম। যতদিন তার কামনা ও অজ্ঞান দূর না হবে ততদিন তার জন্মান্তর গ্রহণ চলবে। কামনা বর্জিত হয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেই মানুষ পুনর্জন্মের চক্র হতে মুক্তি পাবে। মৃত্যুর পর জীব তার কৃত পাপ-পুন্য কর্মের জন্য স্বর্গ বা নরকে যায় এবং সেখান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এই নূতন জন্ম কেমন হবে, সেটা নির্ভর করে পূর্নজন্মের কর্মের উপর। সুকর্মের জন্য সুখ ও সৌভাগ্য এবং কুকর্মের জন্য দুঃখ ও মন্দভাগ্য নির্দিষ্ট থাকে পরবর্তী জন্মে। এই কর্ম-বিধি যেন গণিতের হিসাব অনুযায়ী বিচার।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, কর্ম এক বাহ্য প্রণালীমাত্র। পুরুষ কর্মের দাস নয়, কর্ম-পুরুষের অভীষ্ট সাধনের উপায় মাত্র। নিজের পূর্ণ বিকাশ সাধনই জন্ম জন্মান্তর গ্রহণের উদ্দেশ্য। সেজন্য পুরুষ নিজেই স্থির করবে কিরকম জন্ম ও কর্ম সেই উদ্দেশ্য পূরণের সহায় হবে। সুতরাং পৃথিবীর কর্ম লোকান্তরেই শেষ হয়ে যায়। পুনর্জন্ম, কর্ম, লোকান্তর গমন ও পৃথিবীতে আবার ফিরে আসা—এ সবই হয় চৈত্য পুরুষের স্ব-ইচ্ছায়।

কর্মের পেছনে থাকে নানারকম শক্তির ক্রিয়া - মনের ক্রিয়া প্রাণের ক্রিয়া, কামনা, আবেগ, চরিত্র, ইন্দ্রিয়ের কাজ, সত্য জ্ঞান ও সৌন্দর্যের অনুরাগ, ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং ক্ষমতা, ভালবাসা, সুখ, সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভের প্রয়াস। কর্মের বিচার করতে হলে এ সবেরই হিসাব নিতে হয়। একমাত্র সুনীতিই কর্মের মাপকাঠি নয়।

প্রকৃতির কাজ মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া নয় - স্বাভাবিকভাবেই এই কাজ চলে।



আবার আমাদের জীবন যে আমাদের শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এমনও নয়। অন্যদের শক্তি ও জাগতিক শক্তিরও প্রভাব থাকে। শুধু নৈতিক বিধি ও পাপ-পুণ্য বিচারের দ্বারা প্রকৃতির কাজের পরিমাপ হয় না। বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হবার জন্যই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। সুখ, দুঃখ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য এসব তার সমৃদ্ধি লাভের উপায় মাত্র। জাগতিক সুখ, সাফল্য লাভ জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পুরুষের অভিজ্ঞতা ও সমৃদ্ধিই পুনর্জন্মের কারণ। জগৎ বিচারালয় নয় বা ভগবান বিচারক নয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থাৎ বিশ্বে পুরুষের আত্মপ্রকাশের জন্য কি আবশ্যক সেই অনুযায়ী সর্বত্র ভগবান বিবর্তনের প্রতি সোপান স্থির করছেন। পুনর্জন্ম এইরূপ একটি সোপান মাত্র।

আর একটি প্রচলিত ধারণারও বিরোধিতা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাহল, প্রচলিত ধারণায় মনে করা হয় পুরুষ একই ব্যক্তি থেকে যায় জন্মান্তরেও। এ জন্মের রাম পরজন্মেও রাম থাকবে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, এমন হলে পুনর্জন্মের কোন প্রয়োজনই থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পুরুষের সমৃদ্ধি লাভই মূল কথা। সেজন্য ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন অপরিহার্য। প্রতি জন্মেই পুরুষ নূতন ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এ জন্মের দেহপাতের পর মানুষের প্রাণ ও মনের গঠন কিছু সময় থাকবার পর বিলীন হয়। তবে অভিজ্ঞতার সারাংশ ভবিষ্যতের জন্য থেকে যায়। অতীত ব্যক্তিত্বের সারাংশ অধিচেতনার মধ্যে নিহিত থাকে। এইভাবে নূতন নূতন ব্যক্তিত্বের সারাংশ নিয়ে চৈত্য পুরুষ সমৃদ্ধ হয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

**অবিদ্যার উৎস ও প্রকৃতি (Ignorance, its origin and Nature):**

অবিদ্যার আলোচনার মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের মানুষ, সৃষ্টি এবং বিবর্তন সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়। 'সৃষ্টি'কে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'আধ্যাত্ম শক্তির অবিদ্যায় নিমজ্জন' বলে। 'বিবর্তন' তাঁর মতে অবিদ্যা থেকে ক্রমশঃ 'জ্ঞান' এর দিকে অগ্রগমন।

ভারতীয় দার্শনিকেরা এই বিষয়টিকে কেউ 'অজ্ঞান' অথবা 'অবিদ্যা' বলেছেন, কেউ বা আবার 'মায়া' বলেছেন, যার শক্তি হল এই ভ্রমাত্মক জগতের উদ্ভব বলে মনে করেন অদ্বৈতবাদী। কিন্তু সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, অবিদ্যা, জ্ঞান বা বিদ্যার বিপরীত, এবং অবিদ্যাই হল বন্ধন, দুঃখ-কষ্টের কারণ এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ডের লক্ষ্য হল অবিদ্যা থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের উত্তরণ ঘটানো।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু এই মতের সঙ্গে আংশিক সহমত পোষণ করেন। তাহল: বিবর্তনের লক্ষ্য অবিদ্যা থেকে জ্ঞানরাজ্যে উত্তরণ। কিন্তু তিনি কখনই বিশ্বাস করেন না অবিদ্যা হল জ্ঞানের অভাব। তিনি মনে করেন জ্ঞান এবং অবিদ্যা। উভয়ের মূল স্বরূপ এক।

তাঁর মতে, অবিদ্যা সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তির ব্যাপার হওয়ায় এর মধ্যেই অবিদ্যার উৎপত্তির সন্ধান মিলবে। পরম চিৎকে পরম শক্তিও বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, শান্ত চেতনাময় অবস্থাতে শক্তির স্থান কোথায়?

সাধারণতঃ 'শক্তি' বললে আমরা সক্রিয়তা বুঝি। কিন্তু স্থির অবস্থাতেও শক্তি থাকে। শান্ত অবস্থা শক্তিরই আধার। প্রকৃতিতেও দেখা যায় যে, যা স্থির হয়ে আছে, তাতে অনেকগুলি শক্তি কাজ করছে - শুধু এটি বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়ার সাম্যাবস্থা। ব্রহ্মের শান্ত ও চঞ্চল দুটি অবস্থাই আছে। শান্ত অবস্থায় তিনি যে শক্তিহীন এমন নয়। এই দুই অবস্থাতেই চিৎশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। তপোবলেই ভগবান নিজের মধ্যে শক্তি সংহত করে নিষ্ক্রিয় হন, আবার তপোবলেই তিনি

জগৎকার্যে সক্রিয়। উভয় অবস্থাতেই তপোবল কেন্দ্রীভূত রয়েছে। আবার এটা বলাও ঠিক হবে না যে, ব্রহ্ম এক সময়ে সক্রিয় ও অন্য সময়ে নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম একই সময়ে যুগপৎ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। তিনি শান্ত হয়েও সক্রিয়, সক্রিয় হয়েও শান্ত, আবার তিনি এই সবের অতীতও, পরম অনির্বচনীয়। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে পরব্রহ্ম বা পূর্ণ সচ্চিদানন্দ থেকে অবিদ্যার উৎপত্তি হয়নি।

কিন্তু, যেমন দেহের মধ্যে আমরা আমাদের উপরিস্থ আংশিক চেতনাকেই আমাদের সমগ্র সত্তা বলে মনে করি, সেইরকম যখন অখণ্ড সত্তার ক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র এক অংশের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখি—তখনই অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন আমরা সত্যের একাংশে নিবদ্ধ হয়ে বাকি সব কিছুকে পশ্চাতে রাখি- তখনই অবিদ্যার উদ্ভব হয়। এটি ব্রহ্মের স্বরূপের কোন পদার্থ বা শক্তি নয়। তবে ব্রহ্ম যখন বহু অন্তপুরুষরূপে প্রকাশিত হন তখনও অবিদ্যার উৎপত্তি হয় না।

প্রকৃতপক্ষে মন তার আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ভিত্তি হতে বিচ্যুত হয়ে পার্থিব জীবনে পর্যবসিত হলেই অবিদ্যা আসে। তখন বিভেদকারী মনের কাছে ব্যষ্টি চৈতন্য ও দেহ এক, অথচ দেহ শক্তির একটি গ্রন্থি মাত্র। কিন্তু এই সংকীর্ণ চেতনাও তপোবল অর্থাৎ চিৎশক্তির সমাহিত বা কেন্দ্রীভূত অবস্থা। এই সংকীর্ণ চেতনায় জীব নিজের সমগ্র আত্মা, অন্য জীবের চেতনা ও বিশ্বসত্তার বোধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের দেহগত চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা সমাহিত থাকে। সুতরাং বলা যায়, যখন চেতনা সত্তার কোনো আংশিক জ্ঞানে বা আংশিক ক্রিয়াতে নিবদ্ধ হয়ে অন্য সব কিছু ভুলে যায় তখনই অবিদ্যার উৎপত্তি ঘটে।

**স্বরূপ :**

এই অবিদ্যার স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, এর মূল হল আত্মা ও প্রকৃতির সমগ্রতাকে ভুলে গিয়ে কোনো বিশেষ কার্যে চেতনাকে নিবদ্ধ করা। সাধারণতঃ মানুষ বলতে যা বোঝায় তা তার অন্তর আত্মা নয়, এটি তার বাহ্য চেতনা প্রবাহ। কিন্তু এই চেতনা প্রবাহের পেছনে আছে এক চিৎ সমুদ্র - মানুষ এই সমুদ্রের কথা জানে না, সে বাহ্য প্রবাহেই নিবদ্ধ।

তাই নিজের সমগ্রতাকে ভুলে অংশে নিবদ্ধ হওয়াই অবিদ্যার লক্ষণ। এই আংশিক বাহ্য চেতনায় মানব স্মৃতির কিছু অংশ ছাড়া অতীতকে জানে না, ভবিষ্যৎ তার অজানা। কিন্তু প্রকৃত চেতনার কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ - উভয়ই জানা, অতীত স্মৃতিতে না থাকলেও, সত্তায় বিদ্যমান। আবার এটি ভবিষ্যৎকেও জানতে পারে, কারণ আন্তর সত্তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা ত্রিকালের মধ্যে অবিভক্তভাবে বাস করে।

বিষয়টিকে ভিন্নভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। মানব জীবনে বিভিন্ন রকমের কাজ ও অবস্থা আছে। বিভিন্ন ভূমিকায় একই মানুষ কাজ করছে। যখন যে কাজ করে তখন সাধারণতঃ তার কথাই মানুষের চেতনায় থাকে। বরং সে যত অন্য কাজ ভুলে একটি বিশেষ কাজে নিবদ্ধ হয়, ততই তার কাজে সাফল্য আসে। কিন্তু কোনো বিশেষ কাজে সমাহিত হলেও, সব সময়ই তার সমগ্র সত্তাই কাজ করে, সত্তার কোনো বিশেষ অংশ সক্রিয়, অন্য অংশ নিষ্ক্রিয় তা নয়। কিন্তু অন্য অংশের কথা তার মনে থাকে না। সে তা ভুলে যায়। এরই নাম 'তপঃ' এবং এইখানেই অবিদ্যার উৎপত্তি। এক এক সময় মানুষ তার বিশেষ কাজ বা আবেগের সঙ্গে এমন একীভূত হয় যে তার অন্য কোন কথাই মনে থাকে না।



এইভাবে বিশ্বচেতনায় এমন অবস্থা আসে যখন সব কিছুতেই বিস্মৃতি আসে। এটাই প্রকৃতির নিশ্চেতন অবস্থা। এটি মানুষের জাগ্রত চেতনায় কোন বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ হওয়ারই মত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে, অবিদ্যার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বলা যায়, সচ্চিদানন্দের এই লীলার অর্থই হল বৈপরীত্যের মধ্যে সৎ, চিৎ শক্তি ও আনন্দের বিকাশ। দুঃখ থেকে আসে আনন্দ, বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা বিচ্ছেদের মধ্যে গড়ে উঠবে মিলন, অচেতন হবে চেতন। এই কারণেই সৃষ্টি এবং সৃজনই অবিদ্যা। অন্যভাবে সৃষ্টি হলে অবিদ্যার প্রয়োজন নাও হতে পারত। কিন্তু এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য যখন আপাত বৈপরীত্যের মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ প্রকাশ, তখন এই সৃষ্টিতে অবিদ্যা এক প্রয়োজনীয় উপায়। এক লাফে নিশ্চেতনা হতে পূর্ণ চেতনায় আরোহণ করলে লীলার বৈচিত্র্য থাকত না। তাই অবিদ্যা অভিশাপ নয়, আরোহণের পূর্বপ্রস্তুতি।

সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের মতে, অবিদ্যার স্থান মনে। মন অতিমানস থেকে উৎপন্ন হলেও বহুত্বের জ্ঞানের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ। বহুত্বের মধ্যে ঐক্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও মন তার কথা ভুলে যায়, এর কারণ মন ও অতিমানসের মধ্যে এক আবরণ থাকে। এটাই উপনিষদ এর 'হিরণ্ময়পাত্র'—যা অধিমানসের মধ্যে থেকে অতিমানসিক সত্যের মুখমণ্ডল আবৃত করে। মনের স্তরে এটি আরো অস্বচ্ছ হওয়ায় মন নিম্নে বহুর মধ্যে এদের পরম ঐক্যের কথা ভুলে যায়। একারণে অবিদ্যার আবরণ দূর করার এক উপায় হল মনের বাহ্য বিক্ষিপ্ত চেতনা থেকে সরে এসে প্রচ্ছন্ন আন্তর সত্তায় একাগ্র হওয়া। তবে মনে রাখা প্রয়োজন এই অবিদ্যা বিদ্যারই শক্তি। স্বেচ্ছায় নিজের শক্তি সংকোচ করা পূর্ণশক্তিরই লক্ষণ।

**সপ্তবিধ অবিদ্যা (The Sevenfold Ignorance):**

শ্রীঅরবিন্দ মনে করে, বিদ্যা বা 'জ্ঞান'কে জানতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞানতার প্রকৃতিকে। তবে অবিদ্যা কিন্তু জ্ঞানের অভাব নয়, বরং অসম্পূর্ণ অথবা আংশিক জ্ঞানকেই তিনি 'অবিদ্যা' বলেছেন। 'অবিদ্যা'র স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে সাতরকমের অবিদ্যার কথা তিনি বলেছেন। সেগুলি এইরকম :—

১) মূল অবিদ্যা (The original Ignorance) সকল সত্তা, জীবন ও ঘটনাপ্রবাহের মূল সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁকে আমরা জানতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের চারপাশের বস্তুগুলি, আমাদের দৈহিক উপস্থিতি, বস্তুগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক — এ সব কিছুকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি, অথচ এগুলি আদৌ সমগ্র সত্য নয়—সত্যের কতকগুলি খণ্ড মাত্র।

২) বিশ্ব অবিদ্যা (The Cosmic Ignorance) বিশ্বজগতের যথার্থ প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞ। সাধারণত আমরা বিশ্বাস করি, 'স্থান' ও 'কাল' এর যে জগতে আমরা বাস করি, যে জগতে আমাদের চলাফেরা বা অস্তিত্ব — তাই প্রকৃত জগৎ। কিন্তু আমরা দেশকালাতীত শান্ত অক্ষর পরমাত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ। দেশকালের মধ্যে প্রকাশিত চঞ্চল পরিণাম সমূহকেই সত্তার সমগ্র সত্য মনে করি। এটাই আমাদের দ্বিতীয় অবিদ্যা।

৩) অহমাত্মক অবিদ্যা (The Egoistic Ignorance) আমাদের বিশ্বজনীন আত্মা, বিশ্বসত্তা, বিশ্বচেতনা, সকল কিছুর সঙ্গেই আমাদের অনন্ত ঐক্য—এ সব সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না। আমাদের কাছে নিজের দেহ, প্রাণগত সীমিত অহংই আমাদের সত্যকার আত্মা—অন্য সবই অনাত্ম—এটাই আমাদের অহমাত্মক অবিদ্যা।

৪) কালগত অবিদ্যা (The temporal Ignorance) আমাদের চিরন্তন স্বরূপ সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞ। কালের প্রবাহের মধ্যেই যে আমাদের চিরন্তন প্রকাশ, সে কথা ভুলে গিয়ে বর্তমানের স্বল্প-পরিসর জীবনকেই আদি মধ্য ও অন্ত বলে ধরে নিই। আমরা এটা কখনও উপলব্ধি করতে পারি না যে আমাদের সত্য স্বরূপের অস্তিত্ব এই স্থান ও কালগত আকৃতির ঊর্ধ্বে।

৫) মনস্তাত্ত্বিক অবিদ্যা (The Psychological Ignorance) শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, সাধারণতঃ আমরা জীবনের উপরিভাগের দিকটাকেই দেখি। যেমন, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিই, আমরা কখনও ভাবি না যে ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের 'নির্বাচিত' অংশকেই কেবল আমাদের জ্ঞানরাজ্যে পাঠায়, ফলে তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের বৃহৎ সত্তা যে উপরিস্থিত চেতনার মধ্যে নিবদ্ধ নয়, বরং অতিচেতনা, অবচেতনা, অন্তশ্চেতনা; পরিচেতনার বিশাল রাজ্যরূপে এর অস্তিত্ব—এ জ্ঞান আমাদের নেই।

৬) গঠন বিষয়ক অবিদ্যা (The Constitutional Ignorance) আমাদের জীবনপ্রবাহের গঠন সম্বন্ধেও আমরা অজ্ঞ; দেহ, প্রাণ ও মন, এদের কোনো একটি বা দুটি বা তিনটিকেই আমাদের জীবনের ভিত্তি বা সমগ্র সত্য বলে আমাদের ধারণা। যে প্রচ্ছন্ন অন্তর পুরুষ এদের প্রকৃত সত্তা বা নিয়ন্তা এবং যে ভবিষ্যতে এদের প্রকাশ্য কর্ণধার হবে তার সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ।

৭) ব্যবহারিক অবিদ্যা (The Practical Ignorance) এইসব অবিদ্যার কারণে আমরা আমাদের চিন্তা, সংকল্প, আবেগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। পূর্ণজ্ঞানে বঞ্চিত ও অবিদ্যার অন্তরে থেকে অন্ধের মত সুখ, দুঃখ, ভ্রম, কামনা, প্রয়াস, ব্যর্থতা প্রভৃতির গোলকধাঁধার মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াই।

অতিমানস (Supermind):

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, অতিমানস স্তর স্বতঃই সত্যের অধিকারী। এর জ্ঞান সত্যেরই জ্ঞান— কেবল মানসিক জ্ঞানের মতো ছবি বা চিহ্ন নয়। সাধারণ মন ও অতিমানসের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, যাদের মধ্য দিয়ে অতিমানস, সাধারণ মনে নেমে আসতে পারে এবং সাধারণ মনও ক্রমশ অতিমানসের উচ্চস্তরে আরোহণ করতে পারে। এটাই বিবর্তনের নিয়ম। সাধারণ চেতনার ঊর্ধ্বে উচ্চতর মানসিক চেতনার যে স্তর আছে তা মাঝে মাঝেই সাধারণ চেতনাতে বোঝা যায়। কোনো একটি সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করলে মনে হয় হঠাৎ কোথা থেকে সমাধানের চিন্তাটা এসে পড়লো। সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাদের কোনো বিষয় বুঝতে অনেক সময় লাগে বা কষ্ট করতে হয়। আবার কেউ কেউ আছেন, ঐ একই বিষয় খুব দ্রুত বুঝে আয়ত্ত করে ফেলেন। ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক ক্ষীপ্রতা ও স্বচ্ছতা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। কবি বা গূঢ়বাদীর অনুভূতি অতি উচ্চস্তরের চেতনা। এইসব উচ্চ চেতনার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি হতে হলে প্রথমে বাহ্য চেতনা থেকে সরে এসে অন্তর্মুখী হয়ে আমাদের গূঢ় চৈত্য পুরুষ, আন্তর মন, আন্তর প্রাণ ও আন্তর সূক্ষ্ম শরীরের সন্ধান পেতে হবে।

প্রখরতার তারতম্য হেতু স্তরগুলি উচ্চ বা নিম্ন। সাধারণ মানস চেতনার ঊর্ধ্বে আছে 'উত্তর মানস' (Higher mind)। এতে সাধারণ মনের মতো সত্যের অন্বেষণ করতে হয় না। এই স্তরের চিন্তার মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে ব্যক্তি। এই অবস্থাকে বলা হয় দিব্য-মনন বা সত্য চিন্তন। কিন্তু এর চেয়ে আরো দীপ্ত চেতনা হল 'দীপ্ত মন' বা 'প্রবুদ্ধ



মানস'-যাকে 'Illumined Mind' বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। এই স্তরের শক্তি ও প্রখরতা অনেক বেশি। এই স্তরকে বলা হয় সত্য ও প্রাণ। বৈদিক ঋষিদের নিকট 'সূর্য' সত্যের প্রতিমূর্তি। সেইভাবে বলা যায়, উত্তর মানস স্থির সূর্যালোক এবং দীপ্ত বা প্রবুদ্ধ মানুষের ঊর্ধ্বে জ্বলন্ত সূর্য সত্তার পুঞ্জিভূত রশ্মিরাশি।

এই স্তরের ঊর্ধ্বে সত্যশক্তির আরও মহত্তর শক্তি আছে। একে বলা হয় বোধি বা প্রজ্ঞা। যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "Intuition"। এই বোধই হল নিখুঁত ও নির্ভুল সত্যদৃষ্টি, সত্যচিন্তন, সত্য অনুভূতি ও সত্যক্রিয়া। প্রজ্ঞা বা বোধির উৎসস্থলে আছে 'অধিমানস' (Overmind)- যা অতিমানস ঋত চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই স্তরেও অধিমানসের 'হিরণ্ময় পাত্র' দ্বারা ঋত চেতনার মুখ আচ্ছাদিত থাকে। অধিমানস পরার্ধ ও অপরার্ধের সংযোগসূত্র এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যার মধ্যে অতিমানস চেতনার প্রতিভূ।

অতিমানসের চেতনা অখণ্ড, এতে বিষয় সমূহের মূল সত্য, সমগ্র সত্য এবং প্রতিব্যষ্টিরূপের সত্য একক, এক অবিভাজ্য ঐক্যের সূত্রে গঠিত। কিন্তু অধিমানসের অখণ্ডতা নেই। এর মূল সত্য, সমগ্র ও ব্যষ্টি সত্য। এমনকি এদের একত্ব সম্বন্ধও অবগত। কিন্তু এতে নেই অবিভাজ্য চেতনা। অধিমানসের একান্ত জ্ঞান এবং কেন্দ্রীভূত স্থায়ী চেতনা নয় বা এর কার্যাবলীরও ভিত্তি নয়। এখানে এক একটি শক্তি বা দিক পৃথকভাবে নিয়ে, সেই জ্ঞানকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকশিত করে।

অতিমানস চেতনায় পুরুষ ও প্রকৃতি, চিদ্ ও শক্তি — একই সমগ্র সত্য। কিন্তু অধিমানস চেতনায় এরা পৃথক। এক সমগ্র বহুমুখী সত্তা, বহুদিকে ভাগ হয়ে এক একটি ভাগ, নিজের নিজের ধারা অনুযায়ী বিকশিত হয়। একই চেতনা লক্ষ ধারায় খণ্ডিত হয় এবং প্রতিধারা নিজের নিজের স্বার্থকতার সন্ধান করে। এইভাবে অধিমানস এক সচ্চিদানন্দকে অনন্ত সম্ভাবনার রূপ দেয়। যাতে অনন্ত জগত সৃষ্টি হতে পারে।

এই অতিমানসিক স্তরে সব বিজ্ঞানময় পুরুষ যে একই ধরণের হবে-এমন নয়। সকল বৈচিত্র্যের মূলে এক — এই সত্যই অতিমানসের সত্য।

সুতরাং অতিমানসিক জীব বিভিন্ন হলেও একাত্ম বজায় রাখবে। চেতনার প্রতি কেন্দ্রে, প্রাণের প্রতি স্পন্দনে, দেহের প্রতি কোষে সে অনুভব করবে ভগবৎ উপস্থিতি। তার কাছে সকল জীবই নিজের আত্মা। সে একাধারে ভগবানের ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং বিশ্বাতীত রূপ। নিজে থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে তাঁর চেতনা, সংকল্প এবং কার্যের সংগতি থাকবে।

অনুন্নত জীবের বাহ্য ও আন্তর জীবনে বিরোধ থাকে এবং সে মনে করে জগত বা সংসার তার উন্নতির বাধা স্বরূপ। কিন্তু অতিমানসিক স্তরে যে অতিমানসিক জীবের উদ্ভব হবে, তার কাছে এসব বাধা থাকে না, কেননা জীব ও জগত উভয়েই বিশ্বাতীত ভগবানের বিকাশ। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই।

আমাদের অবিদ্যাই বিরোধের মূল কারণ। অহং বশে আমরা নিজেরা জীবনের মূল দাবি মেটাতে চাই, কিন্তু অতিমানসিক স্তরে জীবের অহংবোধ নেই। 'অবিদ্যা বহির্ভূত ঋতম্ জ্যোতির শক্তিতে সে শক্তিমান। সে যেমন নিজের মধ্যে চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের আনন্দ উপলব্ধি করবে, তেমনি সকলের মধ্যে চাইবে ভগবানের আনন্দ। ক্ষুদ্র আশা বা কামনা, তাদের তৃপ্তি বা ব্যর্থতার স্থান অতিমানসিক স্তরে নেই।

অতিমানসিক জীবনে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব নেই। সুতরাং সেখানে নীতির প্রশ্ন নেই। তাঁর কার্য ও জীবন - তাঁর নিজেরই প্রকাশ। অবিদ্যা ও অহং না থাকলে কোন মিথ্যাচারণ ও অন্যায় ব্যবহার সম্ভব নয়। অবিদ্যাময় মানসিক জীবনে সত্য অজানা — তাই এ স্তরে সত্য সন্ধান করতে হয়। কিন্তু দিব্য জ্ঞানময় অতিমানসিক স্তরে কেবল সত্যেরই প্রকাশ। সত্য কি তা জীব উপলব্ধি করে এবং পরা প্রকৃতির ইচ্ছাই তার কার্য।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন আসতে পারে, সেটি হল অতিমানসের আবির্ভাব ও এর উচ্চস্তরে আরোহণের অর্থ কি এই নয় যে নিশ্চেতনা থেকে ক্রমোন্নতির আগে বা পরে, পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া? অতিমানসের পরের স্তর সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি মনে করেন, এটি চক্রাকারে বিবর্তন। তাই জীব যে চক্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, সেই চক্রেই পুনরায় আরোহণ - তার চরম পরিণতি বলে তিনি মনে করেন। অতিমানস স্তরের প্রভাবে জীবের সমস্তরকম বিরোধের স্থলে আসবে কেবল সামঞ্জস্য - শ্রীঅরবিন্দ একথাই বিশ্বাস করতেন।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে মনোবিজ্ঞানে বিংশশতাব্দীর চিন্তাবিদ্‌দের উপলব্ধিও সহায়ক — বিশেষ করে গেষ্টাল্ট মতবাদীদের শিক্ষাতত্ত্ব। সেখানে বলা হয়েছে— শিক্ষা একান্তভাবেই স্বজ্ঞাজাত এক অন্তর্দর্শন মাত্র। যদিও আপাতদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে এই তত্ত্বের কোন সরাসরি সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু একটা মৌলিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাহল - শিক্ষা নেহাতই যান্ত্রিক 'চেষ্টা ও ভুল সংশোধন' (Trial and Error) মাত্র নয়। এটি 'সহজাত অন্তর উদ্ভাবন' (Insight Flash)। অতিমানসের আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ এই অন্তরের উদ্ভাসিত অবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে মনে হয়।

**অতিমানসের ত্রিপাদ (The Triple Status of Supermind):**

অতিমানসের তিনটি পাদ। প্রথম হল 'অদ্বয় ঐক্য'। এই অদ্বয় ঐক্য কিন্তু সচ্চিদানন্দের পরম অবস্থার ঐক্য নয়। পরম অবস্থায় সচ্চিদানন্দ দেশকালাতীত স্বরূপে একীভূত। অতিমানসের প্রথম পাদের ঐক্য সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা সর্বময় সমভাবাপন্ন আত্মবিস্তার, তবে এক বহু নয়। আমাদের মানস চিন্তাধারার প্রতীতিগুলি যেমন বহু হয়েও একই চিন্তা, সেরূপ বহুভাবে এই আত্মবিস্তার এক দিব্য অনন্ত প্রতীতি। এখানে চিৎ ও শক্তির মধ্যে কোন ছেদ্ নেই।

দ্বিতীয় পাদে এই ঐক্য কিছু প্রসারিত হয়, যাতে একের মধ্যে বহু ও বহুর মধ্যে একের প্রকাশ সম্ভব হয়। এই পাদে অতিমানসের দিব্যচেতনা পশ্চাতে সরে প্রতি নামরূপে পুরুষ অর্থাৎ চিদ্ আত্মাভাবে সমাহিত হয়। এক পরম পুরুষ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন পুরুষ হন। এই পরম পুরুষ পরমাত্মা, আর বিভিন্ন কেন্দ্রের পুরুষ- জীবাত্মা। জীবাত্মা নিজেকে পরম একেরই এক প্রকাশ বলে জানে, আবার এও জানে, যে সে নিজে, অন্য জীবাত্মা ও পরম এক - সবই এক। এ অবস্থায় ঐক্যই মুখ্য, বহু গৌণ।

তৃতীয় পাদে একত্ব বজায় রেখেও বহু প্রধান হতে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায় হয়। পরে মানসিকস্তরে একত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞান হেতু পৃথক অহং এর ভ্রমাত্মক রূপ নেয়। এই পাদে তাই চেতনার ঐক্য গৌণ এবং বহু মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন আনন্দময় দুই পৃথক তত্ত্ব। দ্বিতীয় পাদের চেতনায় পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একাত্মবোধ অটুট থাকে; কিন্তু তৃতীয় পাদের চেতনায় দ্বৈতভাবই প্রবল হয়। একাত্মবোধ দ্বৈতভাবের চরম পরিণতি। অবশ্য এই তৃতীয়



পাদে জীবাত্মা নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে না, শান্ত একের সত্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সত্যকেও সমানভাবে স্বীকার করে। বৈচিত্র্য ও একত্ব একই দিব্যলীলার যথাক্রমে ভিত্তি ও শিখর। তবে বৈচিত্র্যের লীলা মুখ্য, বৈচিত্র্যই একত্বের পূর্ণতা আনে।

এই তিনটি পাদ একই সত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি মাত্র অর্থাৎ দিব্যলীলা আস্বাদনের বিভিন্ন উপায়। উপনিষদে যে বলা হয়—' একই বহু হয়েছেন'— তাতে এ তিনটি পাদেরই সত্য উপলব্ধি স্বীকৃত হয়। এখানে আমরা বলতে পারি প্রথম পাদ 'কারণ অবস্থা'। যেখানে সবকিছু অতিমানসের সৃষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত। দ্বিতীয় পাদ প্রথম পাদের অব্যবহিত ফল, 'কার্য অবস্থা'— যেখানে ক্রীড়া শুরু হয়। তৃতীয় পাদ হল 'পূর্ণ-ব্যক্ত-অবস্থা'—যেখানে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় হয় এবং চেতনা সমস্ত আকৃতি ও কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

সুতরাং এই তিন প্রকার উপলব্ধিই সত্য। পরম এক অনির্বচনীয়, আমদের মানসিক প্রতীতির এক ও বহুর অতীত। একই বহুভাবে প্রকাশের ভিত্তি, আর বহু একেরই প্রকাশ ও দিব্য প্রকাশের মধ্যে ঐক্য আস্বাদনের উপায়।

**ত্রিবিধ রূপান্তর (The Triple Transformation):**

প্রকৃতির অবিদ্যাময় রূপ ছদ্মবেশ মাত্র। স্বরূপতঃ এটি ভগবানেরই আনন্দময় চিৎশক্তি। প্রকৃতির অমূল ও পূর্ণ রূপান্তরই বিবর্তনের লক্ষ্য। কিন্তু কেবল কয়েকজন ব্যক্তি-আত্মা ও পরমাত্মার সন্ধান পেয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রকৃতির উদ্দেশ্য সফল হয় না। এজন্য আবশ্যক পৃথিবীতে এক নতুন সৃষ্টি। মন যেমন আমাদের সহজাত সম্পদ, সেইরকম অতিমানস সত্ত্ব হবে এই নতুন সৃষ্টির সহজাত সম্পদ। এর জন্য প্রয়োজন মানবাত্মার ত্রিবিধ রূপান্তরের - এটাই শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস।

এই ত্রিবিধ রূপান্তরের প্রথমে হওয়া প্রয়োজন চৈত্য রূপান্তর। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সমগ্র প্রকৃতিকে পরিণত করতে হবে চৈত্য পুরুষের যন্ত্র রূপে। দ্বিতীয় রূপান্তর হল আধ্যাত্ম রূপান্তর। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে, এমনকি আমাদের প্রাণ, দেহ ও অবচেতনার অন্ধকারের মধ্যেও উচ্চর জ্যোতি, আনন্দ, জ্ঞান, শক্তি ও শুদ্ধতার অবতরণ ঘটাতে হবে। তৃতীয় রূপান্তর অর্থাৎ রূপান্তরের চরম স্তর হল অতি-মানসিক রূপান্তর। এই অতি মানস স্তরে আরোহণ করলে আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতি অতি-মানসিক জীবে পরিণত হয়।

প্রথম পরিবর্তন অর্থাৎ চৈত্য পুরুষের উন্মেষ, যদিও বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, তবু এটাই জীবের শাশ্বত সত্তা। হৃদয়ের অন্তরতম গুহায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রচ্ছন্ন জ্যোতি আমাদের সত্য পথে চলার নির্দেশ দেয়। আমরা এর কথা জানিনা বলেই ভাবি এটি আমাদের মনের নির্দেশ এবং অবস্থা ভেদে এই নির্দেশকে মান্য কিম্বা অমান্য করি। মানুষের দেহ এবং প্রাণের দাবী যতদিন প্রবল থাকে ততদিন চৈত্য পুরুষের সম্বন্ধে তার কোন চেতনা থাকে না। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থাটাকে বলতে চান মানুষের দেহাশ্রয়ী ইন্দ্রিয় ও জৈবিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ থেকে ক্রমে চৈতন্যের জীবনে রূপান্তর।

কিন্তু চৈত্য পুরুষের অধি-চেতনা থেকে ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তারিত হতে থাকে। ফলে জীবনের ক্রমন্বতির সঙ্গে আমরা কখনও কখনও আমাদের মধ্যে দেহ, প্রাণ ও মনের অতিরিক্ত একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি। অবশ্যই আমাদের দেহ, প্রাণ ও মনের কলুষিত ভাবের দ্বারা এই 'অতিরিক্ত কিছু' - যা আমাদের নির্দেশ দেয়, সেটি বিকৃত হয়ে যায়, ফলে এর শক্তিও দুর্বল

হয়ে পড়ে। প্রথম অবস্থায় আমাদের পক্ষে চৈত্য পুরুষের উপলব্ধি দুরূহ। যদিও চিৎপুরুষ এক কিন্তু প্রকৃতির গঠন ভেদে এর গঠন বিভিন্ন হয়।

আমাদের চেতনা গভীর অন্তর্মুখীন হলে মন-আত্মা, প্রাণ-আত্মা ও শরীর-আত্মার কথা জানতে পারি। তাছাড়া আমরা জানতে পারি আমাদের ভিতরের অন্নময় পুরুষকে। প্রাণময় পুরুষকে ও মনোময় পুরুষকে। এইসব পুরুষ যা আমাদের আত্মার অংশ, সেগুলি আত্মার প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু এদের তৈরী মানসিক, শারীরিক ব্যক্তিত্ব আমাদের চৈত্য ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। এদের প্রত্যেকেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কাজের জন্য একটা গোঁজামিল আনা হয়। আসলে কিন্তু অমিল থেকেই যায়। তাই দেখা যায় একই ব্যক্তির মধ্যে নানা ব্যক্তি আছে। কারুর অন্নময় সত্তা, কারো বা প্রাণময় সত্তা, আবার অন্য কারো মনোময় সত্তা প্রবল। যার অন্নময় সত্তা প্রবল - সে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিয়েই ব্যস্ত। সাধারণতঃ অন্য কোন চিন্তা তার নেই। যার প্রাণময় সত্তা প্রবল - সে চঞ্চল, কর্মঠ ও অশান্ত। যার মনোময় সত্তা প্রবল - মানসিক আদর্শ ও ভাবের প্রতি তার বেশি নিষ্ঠা। সে চায় দেহ ও প্রাণকে তার মনোমত সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে। কিন্তু এরাও কম প্রবল নয়। সেই কারণেই তারা মনের শাসন মানতে চায় না। প্রত্যেকেই চায় নিজের কর্তৃত্ব। এভাবেই বিভিন্ন সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলে। যতদিন না চৈত্য পুরুষের ব্যক্তি রূপ দৃঢ় হয়, ততদিন এই অসামঞ্জস্য চলতেই থাকে। এটি শক্তিশালী হলেই অন্ত পুরুষ সম্মুখে এসে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ আসল রাজা রাজ্যের ভার নেয়। তখনই আমাদের সত্তায় ও জীবনে প্রকৃত সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হয়।

আবার হৃদয়ের মাধ্যমেও সত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হতে পারে। এর পূর্ণ শক্তি পাওয়া যায়, যখন মন নৈর্ব্যক্তিকতা ছাড়িয়ে পরম ব্যক্তি-পুরুষের উপলব্ধি লাভ করে। যদি আমরা আমাদের অহমাত্মক কামনা ও আসক্তি বর্জন করে ভগবৎ কার্যে নিজেদের সংকল্পকে উৎসর্গ করতে পারি, তবে ভক্তিভাবের সঙ্গে এই উৎসর্গ আমাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। আবার মন, হৃদয় ও সংকল্প-এই তিনের যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে আমাদের উপরিস্থিত সত্তা ও প্রকৃতিকে এমন এক অবস্থায় আনবে, যাতে আমরা আরও উন্মুক্ত হব আমাদের অন্তস্থ চৈত্য আলোকের দিকে।

কিন্তু পূর্ণ সাফল্যের জন্য বাইরে থেকে অন্তপুরুষের নির্দেশ নেওয়াই যথেষ্ট নয়। এই কাজ দুরূহ, এর জন্য আবশ্যক বর্হিপ্রকৃতির পরিবর্তন। ধাতু ও শক্তির অচঞ্চলতা, শুদ্ধি ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন।

অন্তর আত্মায় প্রবেশের জন্য এক কার্যকরী উপায় হল পুরুষকে প্রকৃতি থেকে পৃথক করা। এতে মন, প্রাণ ও দেহ - এই তিনের ক্রিয়া থেকে সরে এসে নিজের অন্তর-সত্তাকে নীরব, নৈর্ব্যক্তিক আত্মা সাক্ষীপুরুষ রূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এই উপায়ে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ও মুক্তি হলেও রূপান্তর যে হবেই তা নয়। পুরুষকে শুধু নীরব সাক্ষী হলে চলবে না, তাকে হতে হবে সকল চিন্তা ও কার্যের জ্ঞাতা উৎস ও অধীশ্বর। এর জন্য হয় চৈত্য পুরুষের নয় অতিচেতনার আশ্রয় প্রয়োজন।

প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য এরপর অতিমানসে ও অতিমানসিক প্রকৃতিতে আরোহণ একান্ত আবশ্যক। কারণ এর অবাধ শক্তি আমাদের সত্তার সমগ্র রূপান্তর সাধনে সক্ষম। তবে উচ্চতর চেতনায় আরোহণই যথেষ্ট নয়। নিম্ন প্রকৃতির মধ্যে এর অবতরণও বিশেষ প্রয়োজন। এই



অবতরণের জন্য ব্যক্তির দেহরূপ পাত্রকে সুদৃঢ় করতে হবে। মন ও প্রাণের অহমিকা, মৌল অশুচিতা, নিম্ন আত্মার মিথ্যাচার, কামনা, অজ্ঞানের প্রতি আসক্তি প্রভৃতিকে দূর করতে হবে। হৃদয় মন্দির পবিত্র না হলে দিব্য শক্তি ধারণ অসম্ভব। উর্দ্ধের জ্যোতি ও জ্ঞান মনের সমতা ও নীরবতার মধ্যে নেমে এলে উচ্চতর সত্য ও প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে তারা বুদ্ধির বিভ্রান্তিকে দূর করে। ফলে নূতন চেতনার সৃষ্টি ও নূতনভাব গড়ে ওঠে। তখন সর্বত্র পরম পুরুষের শক্তি আমরা অনুভব করি।

এইভাবেই মানসিক চেতনা পরিণত হয় আধ্যাত্মিক চেতনায়। এটাই আধ্যাত্মিক রূপান্তর। চৈত্য রূপান্তরের পূর্ণতার জন্য যেমন আধ্যাত্ম রূপান্তর প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের পূর্ণতার জন্য অতিমানসিক রূপান্তর আবশ্যক। প্রকৃতি এই শক্তির উপযুক্ত হলেই উর্দ্ধের ঋত চেতনা নিম্নে অবতরণ করে প্রকৃতির অন্তস্থ অতিমানসিক শক্তির প্রকাশে সহায়ক হবে।

**অতিমানসিক জীব এবং দিব্যজীবন (Gnostic Being and Divine life):**

**ক) অতিমানসিক জীবের প্রকৃতি (Nature of Gnostic Being):**

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, অতিমানসিক স্তরের জীবন ও প্রকৃতি কেমন হবে - সেটা মনের পক্ষে বলা অসম্ভব। কেননা মানসিক প্রকৃতির চিন্তা, দৃষ্টি, ইচ্ছা, অনুভব প্রভৃতির মূলে থাকে ভেদাভেদ - অন্যদিকে অতিমানসিক জীবন - এক অখণ্ড ঐক্যের জীবন। সুতরাং এই বিপরীত বিষয়কে বোঝা সহজ নয়, তবে এই সমস্যা সত্ত্বেও মন ও অতিমানসের পার্থক্য থেকেই অতিমানসিক জীবের সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব।

অতিমানসিক জীবের প্রধান প্রকৃতি হল অনন্তের চেতনা ও শক্তি দ্বারা সব কিছুকে দেখা। এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, শুধু যে নিজের আন্তর, বাহির বা সামাজিক জীবনকে অন্তরঙ্গ ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এমন নয়, বরং অনুন্নত মানসিক জীবনের সঙ্গেও সুষমাময় ঐক্য স্থাপন করবে। তখন জগতের সব কিছুরই উপর আসবে এক মহত্তর শক্তির প্রভাব।

অনুন্নত জীবের বর্হিজীবন ও আন্তর জীবনের মধ্যে বিরোধ থাকে। অন্যের সম্বন্ধে তার জ্ঞান সংকীর্ণ, সে মনে করে যে জগৎ সংসার তার উন্নতির বাধাস্বরূপ। কিন্তু অতিমানসিক জীবের কাছে এসব বাধা থাকে না। বিশ্বের সব শক্তি তার নিজেরই শক্তি জেনে সে তাদের সঠিক সম্পর্ককে জানতে পারে। কারণ সে 'জ্ঞানসম্পন্ন' (Gnostic) জ্ঞানই তাঁর সত্তার মূল বিষয়। 'অবিদ্যা' প্রভাবিত আত্মাগুলি 'অহং' এর দাবি মেটাতে যায়। কিন্তু অতিমানসিক জীবের অহং-বোধ নেই। অবিদ্যামুক্ত হয়ে সে সত্যের আলোর 'স্বতম জ্যোতিঃ'র শক্তিতে শক্তিমান। সে যেমন নিজের মধ্যে চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের আনন্দ চাইবে, তেমন সকলের মধ্যে চাইবে ভগবানের আনন্দ। ক্ষুদ্র আত্মা বা কামনা, তাদের তৃপ্তি বা ব্যর্থতা, আমাদের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির পরনির্ভর, আপেক্ষিক সুখ, দুঃখ - এ সবের স্থান এখানে নেই।

বর্তমানে আমাদের জীবন প্রাণশক্তি ও জড়ের অধীন। কিন্তু অতিমানসিক জীব তাদের ব্যবহার করে নিজের সত্য অনুযায়ী, জীবনকে গড়ে তোলে তার নিজের আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তিতে। কারণ, সে তার অন্তঃস্থ স্রষ্টার সঙ্গে এক। অতিমানসিক জীবন এমন এক আন্তর জীবন যাতে ভিতর ও বাইরে, আত্মা ও জগতের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। 'পর' বলে তার কিছু নেই, সবই তার আত্মা। তার মধ্যে বিশ্ব ও সকল কিছু বর্তমান, সকলের সঙ্গে সে চেতনায়, হৃদয়ে,

অনুভবে একাত্ম। সকল বিষয় জীবের আন্তর আত্মার সঙ্গে সে আন্তরিকভাবে যুক্ত ও সক্রিয়। জগতের উপর তার কাজ প্রধানতঃ চিৎপুরুষের শক্তি দ্বারা।

অতিমানসিক জীব জানে যে সব কিছুই তাঁর মধ্যে, 'আত্মার দ্বারা, আত্মার মধ্যে আত্মার দর্শন।' তার আত্মা অহং নয়, যে চিৎপুরুষ সকলের মধ্যে, তিনিই যে তার আত্মা, এই বিশ্ব যে তাঁরই প্রকাশ তা সে জানে। সর্বত্রই সেই 'এক', সবই সেই 'একের' শক্তি ও ক্রিয়া। এখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে কোন ভেদ নেই-সবই এক।

অতিমানসিক চেতনায় জড় ও ব্রহ্ম, জড়তেও অতিমানসিক জীব ব্রহ্মের শক্তি এবং ব্রহ্মের রূপ বলেই জানে। বিশ্বের সেবায় নিজেকে নিবেদনের উদ্দেশ্যেই জড়ের সৃষ্টি। সেইকারণে জড় পদার্থের প্রতি বিজ্ঞানময় পুরুষের কোনো প্রাণের আসক্তি বা কামনা থাকে না। সে একে ঈশ্বর মনে করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই পূজার ন্যায় ব্যবহার ও যত্ন করে। সুতরাং জড় দেহকেও অতিমানসিক জীব এইভাবে দেখে, তাকে আধ্যাত্মময় পূর্ণ ও সার্থক করতে চায়। দেহও হয় সুস্থ, সবল, পূর্ণ, নিরোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। আধ্যাত্মশক্তি ও শাশ্বত প্রশান্তির স্পর্শে দেহ তখন হয়ে ওঠে দিব্যশক্তির আধার।

সুতরাং, বলা যায় অতিমানসিক জীব হল এমন মানুষ যার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে যায় আধ্যাত্মিকতায়। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে আমরা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো। যদি আমরা মানব প্রজন্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, সেই আদিম মানুষ থেকে আজকের সভ্য মানুষের জীবন পর্যন্ত, তবে আমরা দেখতে পাবো, তার কেবল ক্রমোন্নতি ঘটেছে। কোন সম্পূর্ণ নূতন কিছু ঘটেনি, বরং সব কিছুকে দেখার দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটেছে আজকের সমাজে। যেমন, প্রথম আদিম মানুষ যখন স্বর্ণ-অ্যকরিককে দেখতে পেলো, তখন সেটা ছিল তার কাছে আর পাঁচটা সাধারণ পাথরের মতই, কিন্তু যখন মানুষ এর মূল্য সম্পর্কে সচেতন হল, তখন 'স্বর্ণ-আকরিক' সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

সেইরকম অতিমানসিক জীব - সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ নয়। সে হল এমন এক ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করার ফলে তার 'জড়', 'প্রাণ', এবং 'মন' সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

**খ) অতিমানসিক জীবের প্রকারভেদ (Types of Gnostic Beings):**

সকল অতিমানসিক জীব যে একই ধরণের হবে - এমন নয়। সকল বৈচিত্র্যের মূলে এক - এই সত্যই অতিমানসের সত্য। সুতরাং, অতিমানসিক সব জীব বিভিন্ন হয়েও একত্ব বজায় রাখবে। উন্নত চেতনার ক্রম-অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নত জীবেরও আবির্ভাব হবে। আবার অতিমানস স্তর ছাড়িয়েও জীব এর সর্বোচ্চ শিখর হতে ঐক্যময় আত্মোপলব্ধির চরম শীর্ষে উঠবে। এটাই সৃষ্টির গৌরবময় পরিণতি।

অতিমানসিক জীব বিভিন্ন প্রকারের হলেও, প্রত্যেকে ঈশ্বরের অনুপম গঠন হলেও সকলের মধ্যেই থাকবে পরম ঐক্যবোধ, এমনকি, যেহেতু অতিমানসের তিনটি পাদ তাই প্রত্যেক অতিমানসিক জীবই, যথার্থভাবে ঐ তিনটি পাদ বা অবস্থাই লাভ করবে। অন্ততঃ তাদের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য থাকতেই পারে। সুতরাং এই পর্যায়েও এটা বিশ্বাস করা যায় যে, প্রত্যেক অতিমানসিক জীব হবে অতিমানসিক আলোর এক একটি 'অভিনব' প্রকাশ, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে পৃথক হবে, তবে সেই পার্থক্য গুণগত নয়, বলা যায় মাত্রাগত।



**গ) অতিমানসিক জীবে ব্যক্তিত্ব (Personality of the Gnostic Being):**

প্রশ্ন হতেপারে, অতিমানসিক জীব কি আমাদের মত ব্যক্তি না তার জীবন নৈর্ব্যক্তিক? উত্তরে বলা যায়, 'ব্যক্তিত্ব' বললে সাধারণতঃ আমরা বিভেদাত্মক অহংকে বুঝি। আমরা মনে করি যে অহং বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত চেতনায় বিলীন হলে ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, আধ্যাত্ম ব্যক্তি থাকে, তবে মুক্ত, শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়ে সে থাকে স্বর্গে।

কিন্তু এখানে বলা হল যে অতিমানসিক জীব অহংশূন্য হয়েও এই পৃথিবীতেই বিশ্বাতীত পুরুষের শক্তি ও কেন্দ্ররূপে বিশ্বভাবাপন্ন অধ্যাত্ম জীব হয়।

সুতরাং মনে হতে পারে, অতিমানসিক বা বিজ্ঞানময় জীব নৈর্ব্যক্তিক আত্মা এবং সকল বিজ্ঞানময় জীব একই প্রকারের হবে। কারো কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। অতিমানসিক চেতনায় ব্যক্তিত্বে ও নৈর্ব্যক্তিত্বে কোনো বিরোধ নেই। এরা বিপরীতও নয়। এরা একই সদ্-বস্তুর দুই অচ্ছেদ্য দিক। এই সদ-বস্তু আমাদের অহং নয়, এটি হল পুরুষ। এই পুরুষ প্রকৃতির উপাদানে নৈর্ব্যক্তিক ও সার্বিক। কিন্তু এর থেকে সে এক প্রকাশমান ব্যক্তিত্ব গঠন করে যা প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে তার আত্মার রূপ।

নৈর্ব্যক্তিকত্ব হল শক্তি, চেতনা, অস্তিত্ব। এর নানা আকার। উপাদান হিসাবে জীব এক একটি আকার গ্রহণ করে ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য, অথচ প্রতি আকারই নৈর্ব্যক্তিক ও সার্বিক। যেমন প্রেমিকের প্রকৃতি প্রেম, যোদ্ধার সাহস। প্রেম, সাহস - এসব নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বশক্তিরূপ, কিন্তু এরা চিৎপুরুষের বিশ্বসত্তা ও প্রকৃতির শক্তি। ব্যক্তি হল পুরুষ - যে নৈর্ব্যক্তিককে ধারণ করে, যেমন প্রেমিক ধারণ করে প্রেমকে, যোদ্ধা ধারণ করে সাহসকে।

যাকে আমরা 'ব্যক্তিত্ব' বলি তাহল প্রকৃতির স্থিতি ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। পুরুষের যে প্রকৃতি তার সীমা নেই। তার মধ্যে আছে অনন্ত সম্ভাবনা। এদের মধ্য থেকে সে কোনো বিশেষ ধারায় নিজেকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের এক বিশেষ প্রকাশ। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন সৎ, চিৎ, আনন্দ, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য হিসাবে। এইসব তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সার্বিক শক্তি, তার প্রকৃতি। কিন্তু ঈশ্বর নিজে কোনো নৈর্ব্যক্তিক গুণ বা অবস্থা নন। তিনি পরমপুরুষ, একাধারে বিশ্বতীর্ণ, বিশ্বাত্মক ও জীব। এখানে ব্যক্তিত্বে ও নৈর্ব্যক্তিত্বের কোনো বিরোধ নেই।

অতিমানসিক জীব ও ঈশ্বরের মতো একাধারে ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক। সে আধ্যাত্ম জীব, নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সে অধ্যাত্ম জীব, নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ তার বর্ণনা হতে পারে না। সাগরের তরঙ্গমালা যেমন সাগরের প্রকাশ, কিন্তু সাগর শুধু তরঙ্গ নয়, তেমন এক একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য জীবের প্রকাশ - জীব নয়। জীব হল সাগর, আর তার গুণ হল ঐ সাগরের তরঙ্গমালা। তাই অতিমানসিক জীবের চেতনা অনন্ত, কিন্তু তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ।

**ঘ) অতিমানসিক জীব কি জীবন্মুক্ত? (Is the Gnostic Being a Jivanmukta?):**

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানসিক জীবের ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এর সঙ্গে 'জীবন্মুক্ত আত্মা'র তুলনা না করা হয়। কেননা সাধারণ পাঠকের মনে এই দুই বিষয়ের তুলনা আসা স্বাভাবিক। কারণ 'জীবন্মুক্ত' সম্পর্কে সাধারণ ব্যাখ্যায় অতিমানসিক জীব সম্পর্কে ব্যাখ্যার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। বৃহৎ অর্থে, জীবনমুক্ত হলেন তিনি, যিনি এই জীবনেই দৈহিক অবস্থার মধ্যেই মোক্ষকে লাভ করেছেন। তিনি যেন দুই জগতের নাগরিক। তিনি একদিকে এই ঘটনাবহুল বাস্তব

জগতের অধিবাসী, আবার মোক্ষপ্রাপ্ত সত্ত্ব হিসাবে তিনি অতিন্দ্রিয় জগতেও বাস করেন। একদিক থেকে অতিমানসিক জীবও সমপর্যায়ের। তিনিও এই বাস্তব জগতের সঙ্গে একদিক থেকে সম্পর্কিত, আবার আধ্যাত্মিক জগতের জীবনও যাপন করেন।

কিন্তু এই দুই এর ধারণা ঠিক একইরকমের নয়। শ্রীঅরবিন্দ চেষ্টা করেছেন অতিমানসিক জীবের ধারণাকে জীবন্মুক্ত আত্মার ধারণা থেকে আরো সমৃদ্ধ করতে। এ বিষয়ে জীবনমুক্ত আত্মার থেকে অতিমানসিক জীবের ধারণা যে আরো উন্নত সে কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যায়। এই দাবি করার পেছনে যে মূল যুক্তি আছে, তাহল বিজ্ঞানময় পুরুষ অতিমানসিক অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পরও চেষ্টা করে উচ্চতর আলোক এবং চেতনাকে যাতে নিম্নে অবতরণ করে বিবর্তন পদ্ধতিতে সাহায্য করে। কিন্তু জীবনমুক্ত অর্থাৎ একজন মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে তার দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখে ততক্ষণই - যতক্ষণ তার কর্মশক্তি তার দেহকে অস্তিত্বশীল থাকতে সাহায্য করে। যখনই সে এর বাইরে যায় - তখনই তার 'বিদেহমুক্তি' ঘটে। তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায় জন্মচক্র থেকে।

কিন্তু অতিমানসিক জীব, নিজেকে তৈরী করে এমনভাবে যাতে পৃথিবীতে দিব্য জীবনের আবির্ভাব হয়। শুধু নিজেকে নয়, অন্যদেরও সে অতিমানসিক জীবে রূপান্তরিত করে পৃথিবীস্থিত দিব্য জীবনের আবির্ভাব দ্রুত করার জন্য।

কিন্তু এসবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল শ্রীঅরবিন্দের মতে, অতিমানসিক জীব কখনই সম্পূর্ণ নূতন অস্তিত্ব নয়। অতিমানসিক রূপান্তরের জন্যই একটি সত্তার দেহ প্রাণ-মন সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে। তবে এটি এই বাস্তব পৃথিবীতে কোন নূতন জীবন নয় - কেবল জীবের পার্থিব অস্তিত্বকেই ঐশ্বরিক এবং পরিপূর্ণ করে তোলা। তাই বলা যায়, 'জীবন্মুক্ত' সত্তার ধারণা থেকে অতিমানসিক জীবের ধারণা আরো উন্নত।

**৬) অতিমানসিক জীবের কি নৈতিক সমস্যা আছে?**

**(Is any moral problem of Gnostic Being):**

অতিমানসিক জীব প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহল অতিমানসিক জীবনে কি কোন নৈতিক সমস্যা আছে? এর উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, অতিমানসিক জীবনে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব নেই। সুতরাং সেখানে নীতিরও কোন প্রশ্ন নেই। তার কাজ ও জীবন, তার নিজের প্রকাশ - এক অনন্ত সত্যের বিশিষ্ট প্রকাশ ধারা। অবিদ্যা ও অহং না থাকায় কোনো মিথ্যাচারণ বা অন্যায় ব্যবহারও সম্ভব নয়।

বেদান্তের দৃষ্টিতে, মুক্ত পুরুষ পাপ পুণ্য, শুভ, অশুভের উর্ধে। কারণ, মুক্তির অর্থ জীবের প্রকৃত অধ্যাত্ম প্রকৃতি - যার ফলে সব কাজই হয় সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। মানুষের অসম্পূর্ণ অবস্থায় নীতির প্রয়োজন হয়। কি করা উচিত, কি অনুচিত তা জানা দরকারী হয়। এর কারণ, নানা বিরুদ্ধভাব, সংঘর্ষ, অশুভকামনা, বিবাদ প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে মানব জীবনের অসম্পূর্ণ অবস্থায়। কিন্তু যেখানে চেতনা ও সত্তার সত্যের দ্বারা সব কিছু আত্ম-নিয়ন্ত্রিত সেখানে আদর্শ বা আচরণবিধি, পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে না।

অবিদ্যার অবস্থায় জীব সব কিছুকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখে। তাই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ নিজের জীবনে দেহ-প্রাণ ও মনে যেমন দেখা দেয়, তেমনি বিশ্বের অন্যান্যদের সঙ্গেও তার বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ নিরসনের জন্যই নীতির আবশ্যকতা। কিন্তু



অতিমানসিক জীবের নিজের মধ্যে কিম্বা অন্যের সঙ্গে কোন বিরোধ না থাকায় নীতির কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। দিব্য ধর্ম পালনই শ্রেষ্ঠ আচরণ। আর অতিমানসিক জীব যেহেতু সকলকেই আপন বলে জানে, সেজন্য স্বার্থপরতা বা পরোপকারের প্রশ্নও দেখা দেয় না। তাই বলা যায় আমরা মানব জীবনে যাকে 'নৈতিক সমস্যা' বলি তার কোন ভূমিকাই নেই অতিমানসিক জীবনে।

**দিব্যজীবন (The Divine Life):**

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, মানবজীবন যদি জড় থেকে আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হতো অথবা ঈশ্বরে ভ্রম কিম্বা খেয়ালখুশীর ফলে জীবনের উদ্ভব হতো, তবে তা তাৎপর্যহীন হয়ে যেত। জড়জগতের ক্রিয়ার মধ্যে এক বিপুল দৃঢ় চেতনা সক্রিয় - এটাই ক্রমে মানব চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে। মানবজীবন অলীক মায়া নয়, বরং জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে এক শাশ্বত সত্যের প্রকাশ ঘটছে প্রতিনিয়ত - আর মানবজীবন সেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ।

আমরা জানি প্রকৃতির সকল কাজের তাৎপর্যই হল কিছু হওয়া। জ্ঞান, অনুভব, কাজ এসব উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। স্বত্তার আত্ম উপলব্ধির সহায় বলেই এদের মূল্য। কিন্তু এগুলিই জীবনের শেষ কথা বা চরম উদ্দেশ্য নয়। দেহ-প্রাণ ও মনের মধ্যে আমরা যে বাহ্যিক সত্যকে পাই তাকে ছাড়িয়ে আমাদের অন্তরে দিব্যসত্য বিরাজ করছে। তাকে পেতে হবে। আবার পূর্ণ হতে হলে স্বত্তার পূর্ণ আনন্দ পাওয়া চাই। আনন্দহীন জীবন অপূর্ণ। দুঃখ-যন্ত্রণা প্রভৃতি অসম্পূর্ণতারই লক্ষণ। পূর্ণ আনন্দ হল স্বয়ংস্থিত - বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'চেতনা, শক্তি ও আনন্দে পূর্ণ হওয়াই দিব্যজীবন।'

আবার পূর্ণতার অপর অংশ হল - বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। সংকীর্ণ অহং এর মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে জীবন অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। পূর্ণ হতে গেলে সকলকে নিজের বলে অনুভব করতে হবে। তাদের চেতনাশক্তি ও আনন্দকে নিজের বলে অনুভব করলেই দিব্যজীবন সম্ভব। এ জীবন পাওয়ার জন্য প্রথম জানা দরকার আমরা দেহ নই, দেহের উপর নির্ভরশীল নই, দেহ আমাদের যন্ত্র মাত্র। আর এটাও বুঝতে হবে আমাদের সত্তা, সংকীর্ণ অজ্ঞানময় মনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাই মানসচেতনার উর্দ্ধে ওঠা আবশ্যিক এই দিব্যজীবন লাভের জন্য।

কিন্তু অন্তরজীবন ব্যতিরেকে এই দিব্যজীবনে উত্তরণ অসম্ভব। বর্হিমুখী হয়ে বর্হিচেতনায় আবদ্ধ থাকলে এই উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই জীবের প্রয়োজন হল নিজের প্রকৃত সত্তাকে জানা এবং এখান থেকেই দিব্যজীবনে তার উত্তরণের শুরু। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, যেকোন মানুষের পক্ষে দিব্যজীবন লাভ করা সম্ভব - যদি সে অন্তর্মুখী হয়ে নিজের প্রকৃত চেতনাকে উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। উপনিষদের ভাষায় আমাদের চেতনার দ্বারগুলি বর্হিমুখী। তাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থাকে বাইরের দিকে, অন্তরাত্মাকে সে জানে না। শুধু জ্ঞানীরাই অর্ন্তমুখী হয়ে আত্মাকে জানার জন্য সচেষ্ট হয়। বর্হিমুখী মানুষ জীবনের বাহ্যিক বিষয় নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তার কাছে অন্তর জীবন অন্ধকারময় নিশার মতো। কিন্তু যে অর্ন্তমুখী হয়ে অন্তরজীবন পেয়েছে সে জানে বাইরের এই সদাচঞ্চল চেতনাকে রুদ্ধ করে অন্তরের ভেতর নিস্তব্ধতা পেলেই সাধারণ জীবনের পঙ্কিলতার স্থলে মানুষ পেতে পারে ভগবানের দিব্য সুধা। সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বচৈতন্যে তার উত্তরণ ঘটতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, দিব্যচেতনায় উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষের কর্তব্য পারিপার্শ্বিক

বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্ম ও ব্যবহারিক সম্পর্কের পূর্ণতাসাধন। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বের সকল বিষয় ও প্রাণীর সঙ্গে একাত্মতা। শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পূর্ণ বিকশিত জীব নয়—বহু বিজ্ঞানময় পুরুষের দ্বারা এক নতুন জাতির আবির্ভাব।

বর্তমান সামাজিক জীবন বহুলাংশে কৃত্রিম লাভ-লোকসান কষে একত্র থাকার সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিজ্ঞানময় সমষ্টি জীবনে সকলকে নিজেদের একই আত্মার অংশীদার। এক সত্যের ভিন্নপুরুষ বলে জানবেন। সকলের মধ্যে থাকবে ঐক্যবোধ। অহংবোধহীন অতিমানসিক জীব অনুভব করবে একই চিৎশক্তি ক্রিয়া করে চলেছে তাদের সকলের মধ্যে - তারা কেবল যন্ত্রমাত্র।

বর্তমান মানবজীবনের প্রচলিত অনেককিছুই দিব্যজীবনে থাকবে না। বিভিন্ন মানবিক আদর্শ, সংসারনীতির বিরোধ অন্তর্হিত হবে। হিংসাবিদ্বেষ প্রমুখ ধ্বংসাত্মক নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও স্বার্থ প্রণোদিত অসাধু পঙ্কিল রাজনৈতিক সংঘর্ষের স্থান দিব্যজীবনে নেই। দিব্যজীবনে শিল্পকলা থাকবে - কিন্তু এসবের চর্চা হবে প্রাণের প্রকৃত প্রকাশের জন্য - অবসর বিনোদনের জন্য নয়। এক দিব্যসত্যই জীবনের নানাদিক দিয়ে প্রকাশিত হবে মানুষ যখন দিব্যজীবন লাভ করবে।

কিভাবে পরাবিদ্যা বিবর্তনকে প্রভাবিত করে (How Metaphysics intluences the evolution):

দর্শনের 'পরাতত্ত্বে' (Metaphysics) একটি বা একাধিক 'দ্রব্য' (Substance)কে চরম মনে করা হয় যার দ্বারা জগৎ গঠিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই হয় 'আধ্যাত্ম দ্রব্য' (Spiritual Substance) না হয় জড় দ্রব্য (Material Substance) এ দুয়ের একটিতে অথবা দুই এর সমন্বয়ে জগৎ গঠিত এমন ধারণা করা হয়েছে। তবে দার্শনিকরা মূলতঃ একটি দ্রব্যকে সে আধ্যাত্মিকই হোক বা জড়ই হোক, গুরুত্ব দিয়ে জগৎ ব্যাখ্যায় তৎপর হয়েছেন। পাশ্চাত্যের ভাববাদীরা ভাব বা Idea র দিক থেকে জগৎ ব্যাখ্যা করেছেন, বুদ্ধিবাদীরা ঈশ্বর চেতনা ও জড়ের কথা বললেও বোধি বা চৈতন্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার জড়বাদী মার্কস, ফয়েরবাখ্ প্রমুখ দার্শনিকেরা জড়কেই জগতের প্রধান উপাদান বলে স্বীকার করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় দ্রব্যের সমন্বয়ে জগতের গঠন হয়েছে এমন বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর মানুষের রূপান্তরের তত্ত্বে এই 'সমন্বয়ী পরাবিদ্যা' প্রভাবিত করেছে ভীষণভাবে। তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ রূপান্তরের প্রসঙ্গে তাই বলেছেন - ভারত ও পাশ্চাত্য এই উভয় দেশেই আধ্যাত্ম ও জড় - এই দুই উগ্র মতের প্রচলন থাকলেও, প্রধানতঃ মায়াবাদীর মত ভারতীয় চিন্তাধারায় ও জড়বাদীর মত পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে ভারতে অধ্যাত্মচর্চার প্রভূত উৎকর্ষ সত্ত্বেও বাস্তব জীবন অবহেলিত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি চরম হলেও অধ্যাত্মচর্চা তেমন হয়নি।

এই দুটি উগ্র মতের কোনটিই মানব মনকে তৃপ্ত করতে পারেনি। যুক্তি দিয়ে জড় বা চিৎ একটিকে অস্বীকার করলেও মানুষের কাছে জড় ও চিৎ দুইই সত্য মনে হয়। সুতরাং একমাত্র সমাধান হল উপনিষদের উপলব্ধি - 'অন্নম্ ব্রহ্ম' - জড়ও ভগবান। এর তাৎপর্য এই যে জড় এবং পূর্ণ চিন্ময় ভগবানের মধ্যে প্রাণ, মন ও অতিমানস এবং মন ও অতিমানসের মধ্যে বিবিধ পর্যায় বিদ্যমান - এসব ভগবানেরই ক্রমপ্রকাশ। এই জন্যই জড়ের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অর্থাৎ পার্থিব জীবনে দিব্যজীবনের আবির্ভাব ও মৃত্যুর মাঝে অমৃততত্ত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও যুক্তি সম্মত।



জড়বাদীরা মনে করেন 'জড়'ই একমাত্র সত্য, জড়বাদীর এই মতের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা এক হিসাবে কিছু উপকারী, কারণ জড় যে সম্পূর্ণ অলীক নয় -এরও স্থান আছে - তা স্বীকার করা হয়েছে এমতে। মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পৃথীকে স্বীকার করা হয়েছে 'পদ' রূপে। কিন্তু জড়ের অর্থ যদি শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হয় তা হলে জড়ই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এবং মানুষের অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ছাড়াও অন্য নানাবিধ বিষয়ের উপলব্ধি হয়। অবশ্য জড়বাদীরা স্বীকার করে যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বাইরেও কোন তথ্য থাকতে পারে—কিন্তু তা আমাদের অজানা। কিন্তু অজানা বলে যে এদের জানা সম্ভব নয় অর্থাৎ এরা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় তা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। এখন যা অজানা, পরে তা আমাদের গূঢ়শক্তির বিকাশে জ্ঞাত হতে পারে। যাকে আমরা অজ্ঞেয় বলি তা বর্তমানে মনের সীমানার বাইরে হলেও মানসচেতনার শ্রেষ্ঠ বিকাশে বা মানসোত্তর শক্তির জানা সম্ভব।

আধুনিক বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়ের নিকট যা জড় বলে প্রতিভাত হয়, বিজ্ঞান তাকে শক্তি বলে। নব্য বিজ্ঞানে শক্তিই একমাত্র সত্য। কিন্তু শক্তি তো ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক শক্তি থেকেই সকল কিছুর উৎপত্তি - নব্যবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত বেদান্তের 'একং বীজং বহুধা যঃ করোতি' বাক্যের অনুরূপ। বিজ্ঞানের শক্তি সাংখ্যের প্রধানের মত অব্যক্ত এবং একে জড় না বলে পদার্থের এক মানসিক রূপ বলা বেশী সঙ্গত। শক্তি বলতে যে শুধু জড়শক্তি বোঝাবে তা নয়। প্রাণ, মনও শক্তি। বরং বৈদিক ঋষিদের মত জড়, প্রাণ ও মন - একই শক্তির ত্রিবিধ রূপমাত্র —একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার জড় থেকে মন উদ্ভূত হয়েছে — এও স্বীকার করা ঠিক হবে না। বরং জড় শক্তি প্রকৃতপক্ষে চিৎশক্তিরই ক্রিয়া —একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে যাকে আমরা জড়শক্তি বলি তা পূর্ণ চিৎশক্তিরই ছদ্মবেশ - যাতে চিৎশক্তি নিজেকে গোপন রেখে ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্ছে।

মানুষের সংকল্পশক্তির লক্ষ্য — অনন্ত জীবন, অপরিসীম জ্ঞান ও অবাধ শক্তি। মানুষ দেশ-কালের বাধা দূর করে জগতের ওপর নানাভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করে মৃত্যু জয়েরও স্বপ্ন দেখে। এর অর্থ এই যে মানুষের সংকল্পশক্তি এক সর্বদর্শী সর্বসমর্থ শক্তিরই অংশ। অর্থাৎ অনন্ত ভগবানেরই শক্তি। ভগবানই ব্যষ্টি মানবের অহংকে কেন্দ্র করে বিশ্বশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল।

পরিশেষে এই অহংকেন্দ্রগুলিও বিলুপ্ত হবে। বর্তমানে বহুকেন্দ্র হতে বিস্ফুরিত যে শক্তি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ঐক্য সাধনের প্রয়াসী তার পরিবর্তে এক পরমশক্তিই বহুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে স্বীয় ঐক্যকে বিস্তার করছে - এই হবে আমাদের উপলব্ধি। এতেই বিশ্বের সঙ্গে জীবের একত্ববোধ - আর এটাই হবে মানুষের ভবিষ্যৎ রূপান্তরের উপর শ্রীঅরবিন্দের পরাবিদ্যার প্রভাব।

অখণ্ড যোগ (Integral Yoga):

দিব্য জীবন হল বিবর্তনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই দিব্য জীবনকে কিভাবে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে আসবো? শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন জগতের বুকে একদিন দিব্য জীবন নেমে আসবেই, হয় দ্রুত অথবা বিলম্বিত হতে পারে, তবে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম এই অবতরণকে দ্রুত কার্যকরী করতে সমর্থ। কিন্তু কিভাবে কত নির্দিষ্ট ও দ্রুতভাবে এটা সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর হল এটা করা সম্ভব 'যোগ'এর মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দ যেভাবে যোগের

প্রকৃতিকে বুঝেছেন তার 'বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া সম্ভব নয় এ জন্যই যে প্রথমতঃ এই ব্যাখ্যা বিশাল হবে, এবং দ্বিতীয়তঃ এই যোগ অনিবার্যভাবে 'তন্ত্রে'র ওপর নির্ভরশীল। যা এই দার্শনিক আলোচনা পরিসরের বাইরে। এখানে কেবল শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড যোগের দার্শনিক দিকটির আলোচনা করা যেতে পারে।

**অখণ্ড যোগের লক্ষ্য:**

'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ 'যুক্ত হওয়া'। পতঞ্জল যোগ শব্দটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। পতঞ্জল ঈশ্বরকে স্বীকার করলেও তার যোগসূত্রে 'ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে' যোগ বলেননি। যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে পতঞ্জল বলেছেন 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' অর্থাৎ যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। বুদ্ধি, অহংকার ও মন - এই তিনটি তত্ত্বকে একত্রে যোগদর্শনে 'চিত্ত' বলা হয়েছে। এই চিত্ত যখন কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন চিত্ত সেই বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। চিত্তের বিষয়াকার গ্রহণই চিত্তবৃত্তি। যেমন ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন ঘটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত ঘটের আকার গ্রহণ করে অর্থাৎ চিত্তের ঘটাকারবৃত্তি হয়। চিত্তের বৃত্তি হল এই প্রকার জ্ঞানরূপ অবস্থাসকল। আত্মা স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চেতন্য, তাই চেতন্যের বিকার সম্ভব নয়। সুতরাং চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মারই বিকার হয়। চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মাই অবিদ্যাবশত নিজেকে ঐসব বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। এই অবস্থাই হচ্ছে আত্মার বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় আত্মা পঞ্চক্লেশে ক্লিষ্ট হয়. এরূপ বন্ধনমুক্তির জন্যই চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিহীনরূপে অবস্থান করে। চিত্তের এই অবস্থাই 'সমাধি' বা যোগ। কারণ চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হলে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বা আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাই হচ্ছে মুক্তি বা কৈবল্যের অবস্থা।

শ্রীঅরবিন্দের 'অখণ্ড যোগ' কিন্তু পতঞ্জলের 'যোগ' থেকে নানাদিক থেকে পৃথক। এই পার্থক্যগুলি হল:—

**প্রথমতঃ** আমরা বলতে পারি শ্রীঅরবিন্দের যোগ সমন্বয় হল ফলের সমন্বয়। আর পতঞ্জলের যোগ সমন্বয় হল পদ্ধতির সমন্বয়। শ্রীঅরবিন্দ হটযোগের অভ্যাস বাধ্যতামূলক করেননি তার পদ্ধতিতে - যদিও তার ফলাফল পাওয়া যায় তার পদ্ধতিতে।

**দ্বিতীয়তঃ** পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর উপলব্ধির একমাত্র উপায় আত্ম-উপলব্ধি— এটাই চরম লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি বিশ্বচেতনার উপলব্ধির থেকে নিম্নমানের।

**তৃতীয়তঃ** পতঞ্জলের মতে, আত্ম উপলব্ধিতে তুরীয় অবস্থায় কোন বিষয়ের চেতনা থাকে না। এটি অন্য তিনটি চেতনার নিম্ন অবস্থা, যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্নময় এবং স্বপ্নহীন অবস্থা থেকে পৃথক। যখন কোন ব্যক্তি তুরীয় চেতনার অবস্থা থেকে জেগে ওঠে এবং ফিরে আসে জাগ্রত অবস্থায়, তার সমাধি ভেঙ্গে যায়। তখন আত্মা মানসিক অবস্থার দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করে। তাই আত্ম-উপলব্ধি কেবল সম্ভব সমাধির অবস্থাতেই।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে সমাধি চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অপরিহার্য নয়। যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহল জাগ্রত চৈতন্যের রূপান্তর। এটা ছাড়া যোগ কখনও চরম ফল প্রদান করতে পারে না।

**চতুর্থতঃ** পতঞ্জল ও অন্যান্য যোগ শিক্ষাগুরুরা শ্রীঅরবিন্দের আগে একথাই বলে আসছেন শুদ্ধ চেতনার অবস্থায় উত্তরণই বা [illegible] লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, যোগ ব্যক্তিকে



তৈরী করে উপরের দিব্য চিৎ শক্তিকে গ্রহণের উপযোগী করে, মানুষকে হতে হবে দিব্য শক্তিকে গ্রহণের আধার মাত্র। এর জন্য নিজের 'আমিত্ব'কে সম্পূর্ণ বর্জন করাই প্রাথমিক পদক্ষেপ। যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তবেই এই পৃথিবীতে অতিমানসের অবতরণ ঘটবে, এবং ক্রমে এক দিব্য মানব সমাজের উদ্ভব ঘটবে।

**অখণ্ড যোগের বা পূর্ণযোগের প্রকৃতি (Nature of Integral Yoga):**

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যোগ' এর অর্থ ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া', এই সংযুক্ত হওয়া - হতে পারে অতিজাগতিক, অথবা জাগতিক অথবা একক ব্যক্তিগত অথবা তিনটিই একসঙ্গে। আর এই কারণেই তাঁর 'যোগ'কে বলা হয় অখণ্ড। এই যোগ আরোহণের পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করে, এই যোগের কয়েকটি মৌলিক চরিত্র হল এরকম :

ক) ভারতীয় যোগের বিভিন্ন আকৃতিগুলি কিছু বিশেষ ক্ষমতার কর্ষণ করে চলে, অর্থাৎ যোগচর্চা মানেই কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা। আর তাই সকলের কাছে যোগচর্চা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অন্তর যোগের যে রূপরেখা এঁকেছেন তাকে সকলেই অনুসরণ করতে পারে। আর একারণেই তিনি পতঞ্জল যোগের হঠযোগ, প্রাণায়াম এবং আসন এর জটিল শ্বাসপ্রশ্বাস ও দেহের অন্যান্য ক্রিয়াদির ব্যায়াম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। এমনকি তিনি প্রার্থনা মন্ত্রের আবৃত্তি করাকেও সুপারিশ করেননি। তাঁর পূর্ণ যোগ হল অন্তরের যোগ, যেখানে প্রয়োজন কিছু নিয়মশৃঙ্খলা ও পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিকতা-বোধ, যাকে সকলেই অভ্যাস করতে পারে।

খ) অধিকাংশ যৌগিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জগৎ সম্পর্কে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। পতঞ্জলের যোগের লক্ষ্য বিবেকজ্ঞান অর্জন করা। যার মাধ্যমে কেবল আত্মা থেকে অনাত্মাকে পৃথক করা যায়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন, যোগের লক্ষ্য জ্ঞানের মধ্যে পৃথকীকরণ নয়, বরং অনাত্মাকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করা।

গ) অধিকাংশ যৌগিক দার্শনিক বিশ্বাস করেন, যোগে যা প্রয়োজন হয় তাহল স্থূল দেহের ওপরে ওঠা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একথা কখনও বলেননি যে দেহকে সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে বা দমন করতে হবে। বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যোগের লক্ষ্য হল দেহকে অতিমানসিক আলোক দ্বারা উদ্দীপিত করা।

ঘ) অন্যান্য যোগীরা বলেন, ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে মানুষ যোগের মাধ্যমে যুক্ত হয় সমাধির অবস্থায়, তখন জাগ্রত চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং চারপাশের সাধারণ জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বিপরীত দিকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযুক্তিকরণ হওয়া সম্ভব এই দেহেই এবং আমাদের জাগ্রত চেতনার মাধ্যমেই।

ঙ) অন্যান্য যৌগিক দার্শনিকরা বলছেন, যোগের লক্ষ্য হল একক ব্যক্তির মুক্তি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, এটাই যোগের একমাত্র লক্ষ্য নয়। বস্তুতঃ যোগের চরম লক্ষ্যের একটি দিকমাত্র একক ব্যক্তির মোক্ষ, যোগের চরম লক্ষ্য হল সমগ্র মানবজাতির পুনরুদ্ধার করা এবং এই পৃথিবীতে দিব্যজীবনের উন্মেষ ঘটানো।

**কিভাবে যোগ অখণ্ড (How is Yoga Integral)?**

শ্রীঅরবিন্দ দাবি করেছেন তাঁর যোগ অখণ্ড বা সমন্বয়ী যোগ। কারণ প্রথমতঃ এই যোগে সবরকমের যোগের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই যোগের পদ্ধতিতে যে দিকটির ওপর

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা অন্যান্য যোগে উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন, হটযোগে দেহের নানা শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, রাজযোগে গুরুত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'মন'এ, জ্ঞানযোগে জ্ঞানের পথ, ভক্তিযোগে ভক্তির পথ, আর কর্মযোগে কর্মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় এগুলির কোন একটিকে অথবা অপরটিকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন, এই সমস্ত যোগে কেবল এক একটি দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমগ্র পদ্ধতি উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন, জ্ঞান এবং ভক্তি, এরা একে অপরের বিরোধী নয়, অথচ জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তিমার্গ এমনভাবে নিজের নিজের মার্গ বা পথ সম্পর্কে বলে যেন অন্যটা অকিঞ্চিৎকর।

তাই তিনি মনে করতেন, সামগ্রিক বিকাশ এবং সম্পূর্ণ বিকাশ, শুধু জ্ঞানের বিকাশ, কিম্বা শুধু দেহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কিম্বা কেবল গভীর ভক্তি আমাদের সমগ্র সত্তার আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। প্রয়োজন হল দৈহিক, মানসিক এবং সত্তাগত পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন করা সম্ভব পূর্ণ যোগের দ্বারাই। আর এ কারণেই তাঁর যোগকে 'অখণ্ড যোগ' (Integral Yoga) বলা হয়।